ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন

মতিউর রহমান নিজামী

ইসলামী আন্দোলন
ও
সংগঠন

মতিউর রহমান নিজামী

প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৪/১ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন

— মতিউর রহমান নিজামী

প্রকাশক	ঃ	আবু তাহের মুহাম্মাদ মা'ছুম চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৫০৪/১ এলিফ্যান্ট রোড বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯	
২০তম মুদ্রণ	ঃ	মার্চ	- ২০১৪
(জা. ই নবম প্রকাশ)		ফাল্গুন	- ১৪২০
		রবিউস সানি	- ১৪৩৫
নির্ধারিত মূল্য	ঃ	৪০.০০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র।	
মুদ্রণে	ঃ	আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২	

Islami Andolon-O-Sangaton, Written by Mawlana Motitur Rahman Nizami, Published by: Abu Taher Mohammad Ma'sum, Chairman, Publication Department, Bangladesh Jamaate Islami, 504/1 Elephant Road, Baro Mogbazar, Dhaka-1217

Fixed Price : Taka 40.00 (Forty) only.

ভূমিকা

ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন বইটির শেষের তিনটি অধ্যায়– আনুগত্য, পরামর্শ ও ইহতেসাবের উপর কয়েক বছর পূর্বে অনুষ্ঠিত শিক্ষা শিবিরে আমাকে বক্তব্য রাখতে হয়েছিল। জেলা পর্যায়ে দায়িত্বশীলদের জন্যে আয়োজিত সেই শিক্ষা শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেকেই উক্ত বক্তব্য পুস্তিকা আকারে প্রকাশের প্রস্তাব করেছিলেন।

তাদের প্রস্তাবকে সামনে রেখে– বক্তৃতার নোটের আলোকে আনুগত্য, পরামর্শ ও ইহতেসাবের উপর পুস্তিকা তৈরি করতে গিয়ে ভেবে দেখলাম, বিষয় তিনটি ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই উক্ত বিষয়ের অবতারণার আগে ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা না করে পারা গেল না।

বইটিতে কুরআন, হাদিস ও ইসলামী সাহিত্য পাঠের সার নির্যাসই পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সাথে মাঠে-ময়দানের অভিজ্ঞতারও প্রভাব প্রতিক্রিয়া থাকাটা অস্বাভাবিক নয়।

বইখানা পাঠ করে আল্লাহর কিছু সংখ্যক বান্দাও যদি ইসলামী আন্দোলনের সঠিক মেজাজ ও প্রকৃতি আয়ত্ত করতে সক্ষম হন তাহলে আমার শ্রম সার্থক হবে বলে আশা রাখি।

বিনীত

লেখক

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

- **ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন** ৭
  - আন্দোলনের অর্থ ও সংজ্ঞা ৭
  - ইসলামের অর্থ ও সংজ্ঞা ৭
  - ইসলাম ও আন্দোলন ৮
  - ইসলামী আন্দোলনের পরিধি ৯
  - দাওয়াত ইলাল্লাহ ১০
  - শাহাদাত আ'লান্নাস ১৪
  - কিতাল ফি'সাবিলিল্লাহ ১৫
  - ইকামাতে দ্বীন ১৮
  - আমর বিল মা'রুফ ও নেহি আনিল মুনকার ২০

দ্বিতীয় অধ্যায়

- **ইসলামী আন্দোলনের শরয়ী মর্যাদা** ২১
  - ইসলামী আন্দোলনের কাজ আল্লাহর কাজ ২৩
  - এই কাজে শরীক হওয়ার জন্যেও আল্লাহর অনুমোদন প্রয়োজন ২৭
  - ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্যে একটি সতর্কবাণী ২৮

তৃতীয় অধ্যায়

- **ইসলামী আন্দোলনের সাফল্য** ৩৩
  - জাগতিক সাফল্যের কোরআনিক শর্তাবলী ৩৮

চতুর্থ অধ্যায়

- **ইসলামী সংগঠন** ৪৩
  - সংগঠনের অর্থ ও সংজ্ঞা ৪৩
  - সংগঠনের উপাদান ৫১
  - ইসলামী সংগঠনের প্রকৃত মডেল ৫২
  - ইসলামী সংগঠনের কার্যক্রম ও শরয়ী মর্যাদা ৫৩
  - ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্বের শরয়ী মর্যাদা ৫৪
  - ইসলামী সংগঠনের সিদ্ধান্ত সমূহের শরয়ী মর্যাদা ৫৪

আদর্শভিত্তিক ও গণমুখী নেতৃত্বের গুরুত্ব ৫৫
নেতৃত্বের গুরুত্ব ৫৭
ইসলামী নেতৃত্বের সংজ্ঞা ৫৯
ইসলামী নেতৃত্বের প্রক্রিয়া ৬১
সূরা তাওবার শেষ আয়াতটির আলোকে রাসূলের পরিচয় ৭০
হাদিসে রাসূলের আলোকে নেতৃত্বের গুণাবলী ৭১
ঐ বাঞ্ছিত গুণাবলী অর্জনের উপায় ৭৭
নেতৃত্বের মৌলিক দায়িত্ব ৭৮
নেতা ও কর্মীর সম্পর্ক ৭৯

পঞ্চম অধ্যায়

● আনুগত্য ৮১
আনুগত্য কাকে বলে ৮১
ইসলামের সাথে আনুগত্যের সম্পর্ক ৮২
আনুগত্যের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা ৮২
আনুগত্যহীনতার পরিণাম ৮৫
আনুগত্যের দাবী ৮৭
আনুগত্যের পূর্বশর্ত ৮৮
ওজর পেশ করা গুনাহ ৯০
আনুগত্যের পথে অন্তরায় কি কি ৯২
আনুগত্যের পরিবেশ সৃষ্টির রূহানী উপকরণ ৯৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

● **পরামর্শ** ৯৮
পরামর্শের গুরুত্ব সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস ৯৯
পরামর্শ কারা দেবে ১০০
পরামর্শ কিভাবে দেবে ১০২

সপ্তম অধ্যায়

● **সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা** ১০৪
এক : ব্যক্তিগত ইহতেসাব বা আত্মসমালোচনা ১০৬
ব্যক্তিগত ইহতেসাবের পদ্ধতি ১০৬
দুই : পারস্পরিক মুহাসাবা ১০৯
তিন : সাংগঠনিক কাজের মুহাসাবা ১১২
সাংগঠনিক মুহাসাবার উপায় ১১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন

আন্দোলনের অর্থ ও সংজ্ঞা

আন্দোলন, Movement এবং حَرَكَةٌ (হারাকাতুন) এখন একটা রাজনৈতিক পরিভাষা হিসেবেই প্রচলিত। যার সাধারণ অর্থ কোন দাবী-দাওয়া প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং কোন কিছু রদ বা বাতিল করার জন্যে কিছু লোকের সংঘবদ্ধ নড়াচড়া বা উদ্যোগ গ্রহণ করা। এর ব্যাপক ও সামগ্রিক রূপ হলো প্রতিষ্ঠিত কোন কিছুকে অপসারণ করে সেখানে নতুন কিছু কায়েম বা চালু করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা, প্রাণান্তকর চেষ্টা। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ হলো একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করে অন্য একটা ব্যবস্থা কায়েমের চেষ্টা করা। নিছক ক্ষমতার হাত বদলের প্রচেষ্টাও আন্দোলন হিসেবেই পরিচিত হয়ে আসছে। আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটা দেশের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত সংঘবদ্ধ ও সুসংগঠিত প্রচেষ্টাই সত্যিকার অর্থে আন্দোলন নামে অভিহিত হতে পারে।

এভাবে আমরা এক কথায় বলতে পারি, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে পরিচালিত সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা বা সংগ্রাম সাধনার নামই আন্দোলন।

ইসলামের অর্থ ও সংজ্ঞা

ইসলাম শব্দের অর্থ আনুগত্য করা, কোন কিছু মাথা পেতে নেয়া। ইসলাম শব্দের মূল ধাতু سَلْمٌ এর অর্থ আবার শান্তি এবং সন্ধি। পারিভাষিক অর্থে একমাত্র আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূল (সা.) প্রদর্শিত জীবন-পদ্ধতি অনুসরণ করা এবং এর বিপরীত সমস্ত মত ও পথ পরিহার করে চলাকেই বলা হয় ইসলাম। মানুষের ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন মুক্তির এটাই একমাত্র সনদ। মূলত মানুষ ইসলামী আদর্শ কবুলের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাথে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

কোরআনের ভাষায় :

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ-

সন্দেহ নেই আল্লাহ্ তায়ালা ঈমানদারদের জান ও মাল বেহেশতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন, এখন তাদের একমাত্র কাজ হলো আল্লাহর পথে লড়াই করা, সংগ্রাম করা। পরিণামে জীবন দেয়া বা জীবন নেয়া। (সূরা আত তাওবা ঃ ১১১)

সিলমুন অর্থ শান্তি। কিন্তু সে শান্তি নিছক নীতিকথার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কিংবা নয় নিছক কিছু শান্তিমূলক উপদেশবাণীর মধ্যেও সীমাবদ্ধ। ইসলাম-শান্তি এই অর্থে যে, মানুষের জীবন ও সমাজের সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করছে ইসলাম না থাকার কারণে। অন্য কথায় আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামির পরিবর্তে মানুষ মানুষের দাসত্ব ও গোলামিতে নিমজ্জিত আছে বলেই মানুষের সমাজে অশান্তির আগুন জ্বলছে। সর্বশক্তি নিয়োগ করে, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে মানুষের সমাজকে এই অশান্তির কবল থেকে মুক্ত করার জোর তাকিদ ইসলামে রয়েছে বলেই ইসলাম শান্তির বাহক। এই শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক দাবী অনুসারে ইসলামকে শক্তির অধিকারী হওয়া একান্তই অপরিহার্য। এভাবে ইসলামের নিজস্ব পরিচয়ের মাঝে মানুষের সমাজে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটানোর ও উলট পালট করার উপাদান নিহিত রয়েছে।

ইসলাম মানুষের জন্যে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভই তার অন্তর্নিহিত দাবী। সুতরাং ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ আন্দোলনও বটে। মানব সমাজকে মানুষের প্রভুত্বের যাঁতাকল থেকে মুক্ত করে আল্লাহর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে মানুষকে সুখী সুন্দর জীবন যাপনের সুযোগ করে দেয়াই ইসলাম। কাজেই মানুষের প্রকৃত শান্তি, মুক্তি ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই ইসলাম। এই শাশ্বত সত্যটি বাস্তবে উপলব্ধি করতে পারলে যে কোন ব্যক্তিই বলবে ইসলাম মূলতই একটি আন্দোলন। বরং আন্দোলনের সঠিক সংজ্ঞার আলোকে ইসলামই একমাত্র সার্থক ও সর্বাত্মক আন্দোলন।

ইসলাম ও আন্দোলন

আমরা এই পর্যন্ত ইসলামের অর্থ ও সংজ্ঞা প্রসঙ্গে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম তার আলোকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আন্দোলন, সংগ্রাম, বিপ্লব

প্রভৃতি শব্দ আজ ইসলামের আলোচনায় বা জ্ঞান গবেষণায় নতুন করে আমদানী করা হয়নি। ইসলামের মূল প্রাণসত্তার সাথে এই শব্দগুলো ওতপ্রোতভাবেই জড়িয়ে আছে। আল কোরআন ইসলামকে আদ-দ্বীন হিসেবে (অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান) ঘোষণা করেই শেষ করেনি। বরং সেই সাথে এই ঘোষণাও দিয়েছে, এই দ্বীন এসেছে তার বিপরীত সমস্ত দ্বীন বা মত ও পথের উপর বিজয়ী হওয়ার জন্যেই। (আত তাওবা : ৩৩, আল ফাতহ : ২৮, আস সফ : ৯)

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ.

কোন বিপরীত শক্তির উপর বিজয়ী হওয়ার স্বাভাবিক দাবীই হলো একটা সর্বাত্মক আন্দোলন, একটা প্রাণান্তকর সংগ্রাম, একটা সার্বিক বিপ্লবী পদক্ষেপ। এই কারণেই আল কোরআনে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে ঈমানের অনিবার্য দাবী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর হাদিসে বলা হয়েছে,

اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

আল্লাহর পথে জিহাদ বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হবে।

ইসলামী আন্দোলনের পরিধি

আমরা আন্দোলন বলতে যা বুঝে থাকি তার আরবী প্রতিশব্দ اَلْحَرَكَةُ। এই জন্যেই আধুনিক আরবী ভাষায় ইসলামী আন্দোলনের প্রতিশব্দ হলো اَلْحَرَكَةُ الْاِسْلَامِيَّةُ। কিন্তু আল কোরআনের এক্ষেত্রে একটা নিজস্ব পরিভাষা আছে। সেই পরিভাষাটি হলো اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ বা আল্লাহর পথে জিহাদ। حَرَكَةٌ শব্দের মাধ্যমে আন্দোলন, সংগ্রাম বা চেষ্টা সাধনার যে ভাব ফুটে ওঠে, জিহাদ শব্দটা সে তুলনায় আরো অনেক ব্যাপক ও গভীর অর্থ বহন করে। আরবী ভাষায় جُهْدٌ শব্দটাই জিহাদের মূল ধাতু। جُهْدٌ অর্থ যথাসাধ্য চেষ্টা-সাধনা, চূড়ান্ত প্রচেষ্টা, প্রাণান্তকর সাধনা প্রভৃতি। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ অর্থ আল্লাহর পথে চূড়ান্ত ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো।

আল্লাহর পথ কি ? দুনিয়ায় মানুষের জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে পথ ও পন্থা নবী রাসূলদের মাধ্যমে নির্ধারণ করে দিয়েছেন আল্লাহর পথ বলতে সেটাকেই বুঝায়। এই পথে জিহাদ বা চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানোর অর্থ এই পন্থা ও পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করা। যেখানে এই পদ্ধতি

অনুসরণের সুযোগ নেই, সেখানে এমন সুযোগ সৃষ্টির জন্যে সংগ্রাম করা।

জিহাদ শব্দের অর্থের ব্যাপকতার আলোকে আমরা আল কোরআনের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে আন্দোলন, সংগ্রাম বা বিপ্লব প্রভৃতি শব্দের ভাবার্থ বুঝতে চেষ্টা করলে দেখতে পাই- এর কোন একটির মাধ্যমেও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর পুরো অর্থ প্রকাশ করা বা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আল কোরআন দ্বীন প্রতিষ্ঠার গোটা প্রচেষ্টার বিভিন্নমুখী কার্যক্রম এবং প্রতিষ্ঠা লাভের পর তার হেফাযতের উদ্দেশ্যে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ- এই সব কিছুকেই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মধ্যে শামিল করেছে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার সূচনা থেকে সাফল্য লাভ পর্যন্ত এবং সাফল্যের পরবর্তী করণীয় বিষয়ে যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয় সে সবের অর্থ এবং তাৎপর্য বুঝলে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বা ইসলামী আন্দোলনের পরিধির ব্যাপক রূপ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করা সহজ হয়ে যায় ।

আমাদের সমাজে সাধারণত জিহাদকে যুদ্ধ বা যুদ্ধকেই জিহাদ মনে করা হয়ে থাকে। অথচ এটা জিহাদের একটা অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত ব্যাপার হলো যুদ্ধ জিহাদের একটা অংশ মাত্র। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর সূচনা হয় মানব জাতির প্রতি আল্লাহর দাসত্ব কবুলের আহ্বান জানানোর মাধ্যমে।

সহজ, সরল ও দরদপূর্ণ ভাষায় মানবজাতিকে আল্লাহর দ্বীন কবুলের আহ্বান, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব গ্রহণ এবং গায়রুল্লাহর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব বর্জনের আহ্বানই এক পর্যায়ে কায়েমী স্বার্থের সাথে সংঘাত-সংঘর্ষে নিয়ে যায়। তাই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজে অংশগ্রহণকারীকে বাতিল শক্তির সাথে যুদ্ধেও লিপ্ত হতে হয়। এই যুদ্ধ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর গোটা কার্যক্রমের একটা বিশেষ দিক বৈ আর কিছুই নয়। আল-কোরআনের আলোকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর অন্তর্ভুক্ত কাজগুলোকে মোটামুটি ৫টি ভাগে ভাগ করা যায় (১) দাওয়াত ইলাল্লাহ (২) শাহাদাত আ'লান্নাস (৩) কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ (৪) ইকামাতে দ্বীন (৫) আমর বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার। এই পাঁচটি কার্যক্রমের সমষ্টির নামই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বা ইসলামী আন্দোলন। সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের কোরআনী পরিচয় জানতে হলে উল্লিখিত পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করা একান্তই অপরিহার্য।

(১) দাওয়াত ইলাল্লাহ

মানুষের জীবনে ও আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আল্লাহর নির্দেশে নবী রাসূলদের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়েছে। সর্বশেষ নবী

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত সব নবীর আন্দোলনের সূচনা হয়েছে দাওয়াতের মাধ্যমে। আল কোরআন বিভিন্ন নবীর আন্দোলন প্রসঙ্গে ঘোষণা করেছে :

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ـ

আমি নূহ (আ.) কে তাঁর কওমের নিকট পাঠিয়েছিলাম। তিনি তাঁর কওমকে ডাক দিয়ে বললেন, হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর– আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ বা প্রভু নেই। (আল আ'রাফ : ৫৯)

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ـ

এবং আদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হুদ (আ.)কে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বললেন, হে আমার দেশবাসী! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। (আল আ'রাফ : ৬৫)

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا م قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ـ

এবং সামুদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহ (আ.)কে পাঠিয়েছিলাম। তিনি তাঁর দেশবাসীকে ডাক দিয়ে বললেন, হে আমার কওমের লোকেরা ! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। (আল আ'রাফ : ৭৩)

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ـ

এবং মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদেরই ভাই শোয়ায়েব (আ.)কে পাঠিয়েছিলাম। তিনি তাঁর কওমকে ডাক দিয়ে বললেন, হে আমার কওম। তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

(আল আ'রাফ : ৮৫)

শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর আন্দোলনেও তাঁকে প্রথম এভাবে মানব

জাতিকে আল্লাহর দাসত্ব কবুলের আহ্বান জানাতে হয়। তাঁর জীবনের প্রথম গণভাষণের প্রধান বক্তব্য ছিল :

يَاَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ تُفْلِحُوْنَ-

হে মানব জাতি! তোমরা ঘোষণা কর আল্লাহ ছাড়া সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আর কেউ নেই- তাহলে তোমরা সফল হবে। (আল হাদিস)

আল্লাহর দাসত্ব কবুল এবং গায়রুল্লাহর দাসত্ব বর্জনের আহ্বান জানানোর এই কাজটা আল কোরআনে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করা হয়। কোথাও সরাসরি নির্দেশ আকারে এসেছে, যেমন সূরা নাহলের শেষ দু'টি আয়াতে দাওয়াতের পদ্ধতি শেখাতে গিয়ে বলা হয়েছে :

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ-

ডাক, তোমার রবের পথের দিকে হিকমত ও উত্তম নসীহতের সাথে। (আন নাহল : ১২৫)

কোথাও এসেছে রাসূলের কাজ ও পথের পরিচয় প্রদান হিসেবে। যেমন সূরায়ে ইউসুফের শেষ রুকুতে বলা হয়েছে :

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ-

বলে দিন হে মুহাম্মদ (সা.)! এটাই একমাত্র পথ, যে পথে আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই। (ইউসুফ : ১০৮)

সূরায়ে আহযাবে ৪৫-৪৬ আয়াতে বলা হয়েছে :

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۙ
وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا-

হে নবী! আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শকরূপে এবং খোদার নির্দেশে তাঁর প্রতি আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।

আবার কোথাও এসেছে এই কাজের প্রশংসা বর্ণনা হিসেবে। যেমন, সূরায়ে হা-মীম আস সাজদায় ৩৩ আয়াতে বলা হয়েছে :

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۔

আর সে ব্যক্তির কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কারও হতে পারে কি যে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানায় এবং ঘোষণা করে যে, আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।

কোথাও এসেছে উম্মতে মুহাম্মদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। যেমন, সূরায়ে আলে ইমরানের ১০৪ আয়াতে বলা হয়েছে :

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔

তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকতে হবে যারা ভাল কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান করবে, সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দেবে।

সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াতের মূল সুর, মূল আবেদন এক ও অভিন্ন। সবার দাওয়াতের মধ্যেই আমরা কয়েকটি প্রধান দিক লক্ষ্য করতে পারি। প্রথমতঃ সবাই তাওহীদের– আল্লাহর সার্বভৌমত্বের দাওয়াত দিয়েছেন এবং গায়রুল্লাহর সার্বভৌমত্ব পরিহার করার আহ্বান রেখেছেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা সমাজের খুঁটিনাটি সমস্যা সমাধানের প্রসঙ্গ তোলেননি। কিন্তু আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা না থাকার ফলে যে সব বড় বড় সমস্যায় মানুষ জর্জরিত ছিল সেগুলোর কড়া সমালোচনা করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ দাওয়াত কবুল না করার পরিণাম ও পরিণতি দুনিয়া ও আখেরাতে কি হবে এই সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে, ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি এই দাওয়াত কবুলের প্রতিদান-প্রতিফল দুনিয়া ও আখেরাতে কি হবে সে সম্পর্কেও শুভ সংবাদ শুনানো হয়েছে।

আম্বিয়ায়ে কেরামের এই দাওয়াতের মেজাজ প্রকৃতি গভীরভাবে অনুধাবনের ও অনুশীলনের চেষ্টা করলে যে কেউ বুঝতে সক্ষম হবে, এই দাওয়াত ছিল যার যার সময়ের সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের একটা আপোষহীন বিপ্লবী ঘোষণা। এই জন্যেই প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক, ধারক, বাহক ও সুবিধাভোগীদের সাথে তাদের সংঘাত ছিল অনিবার্য।

(২) শাহাদাত আ'লান্নাস

শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর এক পরিচয় বরং প্রধান পরিচয় যেমন দা'য়ী ইলাল্লাহ বা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী, তেমনি তাঁর অন্যতম প্রধান পরিচয় হলো দাওয়াতের বাস্তব নমুনা হিসেবে, মূর্ত প্রতীকরূপে শাহেদ এবং শহীদ। কোরআনে বলা হয়েছে :

اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلاً۔

আমি তোমাদের প্রতি রাসূল পাঠিয়েছি সত্যের সাক্ষীরূপে। যেমন সাক্ষীরূপে রাসূল পাঠিয়েছিলাম ফেরাউনের প্রতি। (মুয্যাম্মিল : ১৫)

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا۔

আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে। (আল-আহযাব : ৪৫)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا–

এভাবে আমি তোমাদের একটি উত্তম জাতিরূপে গড়ে তুলেছি– যাতে করে তোমরা গোটা মানবজাতির জন্যে সত্যের সাক্ষ্যদাতা (বাস্তব নমুনা) হতে পার এবং রাসূল (সা.) যেন তোমাদের জন্যে সাক্ষ্য বা নমুনা হন। (আল বাকারা ১৪৩)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ۔

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্যে সত্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়াও। (আল ম'য়েদা : ৮)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ۔

যার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সাক্ষ্য বর্তমান রয়েছে সে যদি তা গোপন করে তাহলে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে? (আল বাকারা : ১৪০)

এই শাহাদাত মূলত দাওয়াতেরই একটা বাস্তব রূপ। জীবন্ত নমুনা পেশ করার মাধ্যমেই যুগে যুগে নবী রাসূলগণ তাদের দাওয়াতকে মানুষের সামনে বোধগম্য ও অনুসরণযোগ্য বানানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁরা সবাই এই সাক্ষ্য দুই উপায়ে প্রদান করেছেন।

এক : তারা আল্লাহর দ্বীনের পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। এটা মৌখিক সাক্ষ্য।

দুই : তারা যা বলেছেন বাস্তবে তা করে দেখিয়েছেন। মৌখিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাদের আমল আখলাক গড়ে তুলেছেন।

শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) এই ব্যাপারে উত্তম ও পরিপূর্ণ আদর্শ উপস্থাপন করেছেন। রাসূলে করীম (সা.)কে উত্তম আদর্শ বা উসওয়াতুন হাসানা হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর আদর্শের সার্থক অনুসারী ও উত্তরসূরী হিসেবে তাঁর উম্মতকেও দা'য়ী ইলাল্লাহ হওয়ার সাথে সাথে শুহাদা আ'লান্নাসের ভূমিকা পালন করার তাকিদ স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছেন। মক্কী জিন্দেগীর চরম প্রতিকূল পরিবেশে রাসূল (সা.) যে অল্প সংখ্যক সাথী পেয়েছিলেন, তাঁরা আল্লাহর নবীর দাওয়াত কবুল করে নিজেরাও দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং এই দাওয়াতের পক্ষে নিজেদেরকে বাস্তব সাক্ষী বা নমুনারূপে গড়ে তোলেন যার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছেন সূরায়ে ফোরকানের শেষ রুকুতে এবং সূরায়ে মুমিনুনের প্রথম রুকুতে।

এভাবে বাস্তব সাক্ষ্যদানকারী এক দল লোক তৈরি হওয়ার উপরই আল্লাহর সাহায্য এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজের সাফল্য নির্ভর করে বিধায় ইসলামী আন্দোলনে এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী।

(৩) কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ

দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা যখন প্রতিকূল পরিবেশে নানা বাধা-বিপত্তি ও ঘাত-প্রতিঘাতের মোকাবিলা করে সামনে এগুতে থাকে, মৌখিক দাওয়াতের পাশে তখন বাস্তব জীবনে আমূল পরিবর্তন আনার মাধ্যমে আমলি শাহাদাত বাস্তব সাক্ষ্যদানে সক্ষম হয়। তাদেরকে এই দাওয়াত থেকে বিরত রাখা, তাদের আওয়াজকে স্তব্ধ করার ক্ষেত্রে জালেমের জুলুম নির্যাতন হার মানে, হার মানে লোভ-প্রলোভনও। তখন সমাজের মানুষের মনের উপরে দাওয়াত প্রদানকারীদের নৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। কায়েমী স্বার্থের শ্রেণীভুক্ত লোকেরা সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে তখন তারা দা'য়ীদেরকে নিশ্চিহ্ন করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।

খোদাদ্রোহী শক্তির বিরোধিতার জবাবে দা'য়ীদেরকে ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা দেখানোর নির্দেশ রয়েছে। মক্কী জীবনের শেষ দিকে তাদের জুলুম নির্যাতনের প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি সীমিতভাবে দেয়া হয়েছে সূরায়ে 'নাহল' এবং 'শূরার' মাধ্যমে। তাও এমন শর্তসাপেক্ষ যে, সেখানে প্রতিশোধ না নিয়ে বরং ক্ষমা করাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু দা'য়ীগণ উল্লেখযোগ্য জনসমর্থন পাওয়ার পর, মদিনায় একটি ইসলামী সমাজ কায়েমের পর খোদাদ্রোহী শক্তির জুলুম নির্যাতনের প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি তাদেরকে দেয়া হলো সূরায়ে হজ্জের মাধ্যমে এবং প্রত্যক্ষ যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হলো সূরায়ে মুহাম্মদের মাধ্যমে। এই জন্যে এই সূরার আর এক নাম সূরায়ে কিতাল। ইসলামী আন্দোলনে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজে এই সংঘাত ও সংঘর্ষ অনিবার্য।

তাই তো আল কোরআনের ঘোষণা

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ ـ

যারা ঈমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে আর যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। (আন নিসা : ৭৬)

ইসলামী সমাজ পরিচালনার উপযোগী লোক তৈরি হলে, ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে, সেই সাথে আমলি শাহাদাতের মাধ্যমে জনগণের মন জয় করে তাদের সাথে নিতে সক্ষম হলে আন্দোলন এই স্তর (সংঘর্ষের স্তর) অতিক্রম করে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। এই পর্যায়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে আল কোরআনের নির্দেশ :

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ـ

ফেৎনা দূরীভূত হয়ে দ্বীন কায়েম না হওয়া পর্যন্ত লড়াই করতে থাক। (আল বাকারা : ১৯৩)

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ.

ফেৎনা ফাসাদ মূলোৎপাটিত হয়ে দ্বীন পরিপূর্ণরূপে কায়েম না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই অব্যাহত রাখ। (আল আনফাল : ৩৯)

قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَايُحَرِّمُوْنَ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَلَايَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ -

যুদ্ধ কর আহলে কিতাবীদের সেইসব লোকদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে না। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তাকে হারাম সাব্যস্ত করে না। (তাদের সাথে লড়াই অব্যাহত রাখ) যতক্ষণ না তারা নিজেদের হাতে জিযিয়া দিতে ও ছোট হয়ে থাকতে প্রস্তুত হয়। (আত-তাওবা : ২৯)

আল কোরআনের আলোচনায় জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজকে যেমন আমরা ঈমানের অনিবার্য দাবীরূপে দেখতে পাই তেমনি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর এই অংশবিশেষ অর্থাৎ কিতাল ও ঈমানের দাবী পূরণের উপায় হিসেবে বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে :

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ-

যারা ঈমানের ঘোষণা দিয়েছে তাদের জান ও মাল আল্লাহ খরিদ করে নিয়েছেন বেহেশতের বিনিময়ে। (এখন তাদের একমাত্র কাজ হলো) তারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে জান ও মাল দিয়ে। এই লড়াইয়ে তারা জীবন দেবে এবং জীবন নেবে। (আত-তাওবা : ১১১)

এই কিতালের নির্দেশ মূলত দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের সমাজ থেকে অশান্তির কারণ যাবতীয় ফেতনা ফাসাদের মূলোৎপাটন করার জন্যেই। এই হিসেবেই আমরা আল কোরআনে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কার্যক্রমের মধ্যে ইকামাতে দ্বীনের একটা পরিভাষাও দেখতে পাই।

(৪) ইকামাতে দ্বীন

ইকামাতে দ্বীন অর্থ দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা। আর দ্বীন কায়েম বলতে বুঝায় কোন একটা জনপদে দ্বীন ইসলাম বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণ বিধি-বিধান অনুসরণ ও বাস্তবায়নের পথে কোন প্রকারের বাধা ও অন্তরায় না থাকা। কোন দেশে যদি ইসলামী অনুশাসন বা কোরআন সুন্নাহর বিপরীত আইন চালু থাকে তাহলে জীবন যাপনের আন্তরিক নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও ঐ আইনের কারণে তা মানা সম্ভব হয় না। কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যদি ইসলামী আদর্শের বিপরীত কিছু শেখায় এবং ইসলাম না শেখায় তাহলে সেখানেও ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার মত মন মানসিকতাই তৈরি হয় না। যে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ও পরিবেশ ইসলামী আদর্শের বিপরীত, সেখানেও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা সম্ভব নয়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ জীবনের চাবিকাঠি যাদের হাতে, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক সর্বসাধারণ তাদের অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। সুতরাং সমাজের এই নেতৃস্থানীয় ও প্রভাবশালী জনগোষ্ঠী যারা দেশ, জাতি ও সমাজ জীবনের স্নায়ুকেন্দ্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে তারা যদি ইসলামী আদর্শ বিরোধী হয় তাহলেও সেই সমাজের মানুষ ইসলাম অনুসরণ করার সুযোগ পায় না।

ব্যক্তি জীবনে ব্যক্তিগত উদ্যোগে যতটা দ্বীন মানা হয় তা পরিপূর্ণ দ্বীনের তুলনায় কিছুই নয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে সামগ্রিক ও পরিপূর্ণ দ্বীন মানা তো দূরের কথা আনুষ্ঠানিক ইবাদতগুলোরও হক আদায় করা হয় না। ব্যক্তিগত উদ্যোগে নামাজ আদায় হতে পারে কিন্তু কায়েম হয় না। অথচ নামাজ কায়েমেরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আদায়ের নয়। এমনিভাবে জাকাত আদায়ও সঠিক অর্থে ব্যক্তিগত উদ্যোগে হতে পারে না। রোযা তো এমন একটা পরিবেশ দাবী করে যা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সম্ভব নয়। হজ্জের ব্যাপারটা আরও জটিল। নামাজ, রোযা এবং জাকাত তো ব্যক্তি ইচ্ছে করলে সঠিকভাবে হোক বা নাই হোক তবুও আদায় করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ছাড়পত্র ছাড়া হজ্জের সুযোগ বর্তমান ব্যবস্থায় না থাকায় ব্যক্তি ইচ্ছে করলেও হজ্জের ফরজ আদায় করতে পারছে না। সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধের কোন একটিও পালন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। অর্থনৈতিক জীবনে আমরা সুদ বর্জন করতে সক্ষম হচ্ছি না। সমাজ জীবনে

বেপর্দেগী ও উলঙ্গপনা-বেহায়াপনা থেকে আমরা বাঁচতে পারছি না। যেনা শরীয়তে নিষিদ্ধ হলেও রাষ্ট্রীয় আইনে এর জন্যে লাইসেন্স দেয়া হচ্ছে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন-খারাবী প্রভৃতি সামাজিক অপরাধ ও নৈতিকতা বিরোধী কাজের মূলোৎপাটন করে সৎকাজের প্রসার ঘটানোর সুযোগ এখানে রুদ্ধ। যেখানে দেশে দ্বীনের আনুষ্ঠানিক ও সামগ্রিক দিক ও বিভাগের অনুসরণ ও বাস্তবায়নে উল্লিখিত কোন বাধা নেই বরং দ্বীনের বিপরীত কিছুর পথে অনুরূপ অন্তরায় আছে সেখানেই দ্বীন কায়েম আছে বলতে হবে। এভাবে দ্বীন কায়েম হওয়ার জন্যেই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। সব নবী রাসূলেরই দায়িত্ব ছিল এভাবে দ্বীনকে বিজয়ী করার চেষ্টা করা। আল্লাহ তায়ালা সূরায়ে শূরায় ঘোষণা করেছেন :

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَاتَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ -

তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের সেই নিয়ম কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছেন যার নির্দেশ তিনি নূহ (আ.)কে দিয়েছিলেন। আর যা এখন তোমার প্রতি যে হেদায়াত ওহীর মাধ্যমে প্রদান করেছি, আর সেই হেদায়াত যা আমি ইব্রাহীম (আ.), মূসা (আ.)-এর প্রতি প্রদান করেছিলাম। (সব নির্দেশের সার কথা ছিল) তোমরা দ্বীন কায়েম কর এই ব্যাপারে পরস্পরে দলাদলিতে লিপ্ত হবে না। (আশ শূরা : ১৩)

এভাবে দ্বীন কায়েমের চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানোটাই ইসলামী আন্দোলনের জাগতিক লক্ষ্য। আর এরই মাধ্যমে অর্জিত হয় পারলৌকিক লক্ষ্য অর্থাৎ নাজাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি।

শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)কে দুনিয়ায় পাঠানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল কোরআনে যা বলা হয়েছে তারও সার কথা এটাই।

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজের আওতাভুক্ত অপর কাজটি আমর বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার সঠিকভাবে দ্বীন কায়েম হওয়ার পরেই হতে পারে।

আল কোরআন ঘোষণা করছে: ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

এরা তো ঐসব লোক যাদেরকে আমি দুনিয়ায় ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব দান করলে তারা নামাজ কায়েম করে, জাকাত আদায় করে এবং সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজে বাধা দান করে। (আল-হাজ্জ : ৪১)

(৫) আমর বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার

সৎকাজের আদেশ প্রদান ও অসৎকাজে বাধা দানের কাজটা বিভিন্ন পর্যায়ে আঞ্জাম দেয়া যায় :

এক. সাধারণভাবে গোটা উম্মতে মুহাম্মদীরই এটা দায়িত্ব। একদিকে এই দায়িত্ব তাদের পক্ষ থেকে আঞ্জাম দেবে তাদেরই আস্থার ভিত্তিতে পরিচালিত রাষ্ট্র ও সরকার। অন্যদিকে এই ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে তারা যার যার জায়গায়, এলাকায় এই কাজ আঞ্জাম দিতে বাধ্য।

দুই. সরকারী প্রশাসনের মাধ্যমে এই কাজের আঞ্জাম পাওয়াটাই শরীয়তের আসল স্পিরিট। ইসলামী সরকারের গোটা প্রশাসন যন্ত্রই এই কাজে ব্যবহৃত হবে। আবার এর জন্যে নির্দিষ্ট কোন বিভাগও থাকতে পারে।

আমরা উপরে যে পাঁচটি বিষয়ে আলোচনা করলাম অর্থাৎ দাওয়াত ইলাল্লাহ, শাহাদাতে হক, কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ, ইকামাতে দ্বীন এবং আমর বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার– এই সবটার সমষ্টির নাম ইসলামী আন্দোলন বা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী আন্দোলনের শরয়ী মর্যাদা

আল কোরআনের আলোকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর আওতাভুক্ত যে কাজগুলোর আলোচনা করা হলো, ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এই সবগুলো কাজই ফরজ। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন যে ফরজ এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ফরজের ক্ষেত্রে ফরজে আইন ও কেফায়ার বিতর্ক তোলারও কোন সঙ্গত কারণ নেই। ফরজে কেফায়া ফরজই এবং যে কোন নফল ও সুন্নাত কাজের তুলনায় বহুগুণে উত্তম ও অনেক বেশী মর্যাদাসম্পন্ন কাজ। উপরন্তু ফরযে কেফায়ার প্রসঙ্গটা আসে কেবল কিতালের পর্যায়েই। কিতালের ব্যাপারে বৃদ্ধ, রুগ্ন প্রভৃতিকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। দাওয়াতের কাজ যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থায় একজন মানুষ আঞ্জাম দিতে পারে। সত্যের সাক্ষ্য পেশের ব্যাপারটাও এই পর্যায়েরই। ইকামাতে দ্বীন তো ব্যাপক অর্থবোধক একটি পরিভাষা যার মধ্যে দাওয়াত, শাহাদাত, কিতাল এবং আমর বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকারও শামিল। সুতরাং এর বেশীর ভাগ কাজগুলো যে কোন মানুষ যে কোন অবস্থায় আঞ্জাম দিতে পারে।

কোরআন এবং সুন্নাহর আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করলে আরো সুস্পষ্টভাবে যে সত্যটি আমাদের সামনে ভেসে উঠে তা হলো– ইসলামী আন্দোলন বা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজ শুধু ফরজ তাই নয়, সব ফরজের বড় ফরজ। অন্যান্য ফরজ কাজসমূহের আঞ্জাম দেয়া সম্ভবই নয়– এই ফরজ আদায় না করে। নিম্নের ছয়টি বিষয়ের আলোকে বিচার করলে আমরা এর গুরুত্ব আরও ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারব।

১. মানুষ আল্লাহর খলিফা। খলিফা হিসেবে দুনিয়ায় তাকে যে কাজটি করতে বলা হয়েছে তা হলো আল্লাহর দ্বীনের ভিত্তিতে জীবন যাপন করা। একমাত্র আল্লাহর হুকুম-আহকাম মেনে চলা– জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও বিভাগে এটা করতে হলে ইসলামী আন্দোলন ছাড়া গত্যন্তর নেই।

২. আল্লাহর খলিফা হিসেবে মানুষ এই দুনিয়ায় কি দায়িত্ব পালন করবে, কিভাবে সে দায়িত্ব আঞ্জাম দেবে তা শেখানোর জন্যেই এসেছেন যুগে যুগে

আম্বিয়ায়ে কেরাম (আলায়হিমুস সালাম)। তারা সবাই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। কোন একজন নবীর জীবনেও এর ব্যতিক্রম কিছু দেখা যায় না।

৩. শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর কাজ সম্পর্কে আল কোরআন যে সব ঘোষণা দিয়েছে তার মূল কথা আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার সংগ্রাম পরিচালনা এবং নেতৃত্ব দান ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি ২৩ বছরের নবুয়তী জীবনে বাস্তবে যা করেছেন তাও একটি বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা। শুধু তাই নয়, কিয়ামত পর্যন্ত অনুরূপ আন্দোলন পরিচালনার ব্যবস্থাও তিনি রেখে গেছেন। যে কাজটি তিনি নিজে আঞ্জাম দিয়েছেন, সে কাজটি কিয়ামত পর্যন্ত জারি রাখার দায়িত্ব তিনি তাঁর উম্মতের উপর অর্পণ করেছেন।

৪. সুতরাং উম্মতে মুহাম্মাদী হিসেবে পরিচয় দিতে হলে এই দায়িত্ব পালন অবশ্যই করতে হবে। উম্মতে মুহাম্মদী হিসেবে এই দায়িত্ব পালনের তাকিদ প্রথমতঃ সরাসরি আল কোরআন থেকে প্রমাণিত। দ্বিতীয়তঃ সুন্নাতে রাসূলেও এর সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তৃতীয়তঃ এই ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের (রা.) ইজমা রয়েছে।

৫. আল কোরআন এবং সুন্নাতে রাসূলে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজটাকে ঈমানের অনিবার্য দাবী হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে :

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ -

যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পথে, খোদাদ্রোহিতার পথে। (আন নিসা : ৭৬)

৬. আল কোরআনে আখেরাতে নাজাতের উপায়, একমাত্র উপায় হিসেবে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানের সাথে সাথে আল্লাহর পথে মাল দিয়ে ও জান দিয়ে সংগ্রাম করার, জিহাদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সুতরাং ইসলামী আন্দোলন নিছক কোন রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। এই যুগের কোন নতুন আবিষ্কারও নয়। এই আন্দোলনের মাধ্যমেই শরীয়তের প্রধানতম ফরজ কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব। সমস্ত নবী রাসূলগণের তরিকা অনুসরণ করতে হলে উম্মতে মুহাম্মদীর হক আদায় করতে হলে, ঈমানের দাবী পূরণ করতে

হলে, সর্বোপরি আখেরাতে নাজাতের পথে চলতে হলে ইসলামী আন্দোলনে যোগদান ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।

ইসলামী আন্দোলনের কাজ আল্লাহর কাজ

মানুষের জীবনে ও আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজটা মূলত আল্লাহরই কাজ। সৃষ্টির সর্বত্র আল্লাহর হুকুম আল্লাহ নিজেই সরাসরি কার্যকর করেছেন। মানুষের সমাজেও তারই হুকুম চলুক এটাই তার ইচ্ছা। এখানে ব্যতিক্রম এতটুকু যে, মানুষকে সীমিত অর্থে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। সৃষ্টি জগতের কোথাও আর কারও কোন স্বাধীনতা নেই। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সবাই আল্লাহর হুকুম বা তাঁর দেয়া নিয়ম-নীতি মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু মানুষকে আল্লাহ এভাবে বাধ্য করেননি। নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে মানুষকে এইটুকু সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ আল্লাহ দিয়েছেন যে, সে আল্লাহর দেয়া নিয়ম-নীতি অনুযায়ী চলতে পারবে, আবার এটা অমান্যও করতে পারবে। কিন্তু আল্লাহ চান যে, মানুষ তার এই স্বাধীন ইচ্ছাকে আল্লাহর হুকুম মেনে চলার কাজেই প্রয়োগ করুক। সুতরাং যখন মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছাকে আল্লাহর হুকুম মানার কাজে প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। এই কারণেই দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে আনসারুল্লাহ– আল্লাহর সাহায্যকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আল কোরআনে ঘোষণা করেছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ۔

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও। (আস সফ : ১৪)

অর্থাৎ মানুষের সমাজে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা হোক আল্লাহর এই ইচ্ছা বাস্তবায়নে সাহায্য কর। এভাবে আল্লাহর কাজে সাহায্য করার অনিবার্য দাবী হলো আল্লাহর সাহায্য পাওয়া। আল্লাহ বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ۔

তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের স্থিতি সুদৃঢ় করে দেবেন। (মুহাম্মদ : ৭)

সুতরাং যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয় তারা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যায়, আর আল্লাহও তাদের সাহায্যকারী হয়ে যান। আর আল্লাহ যাদের সাহায্যকারী হয়ে যান তাদেরকে দুনিয়ার কোন শক্তিই পরাভূত করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এভাবে যারা আল্লাহর সাহায্যকারীর তালিকাভুক্ত হয়ে যায় তারাই আল্লাহর অলি হিসেবে গৃহীত হয়। যারা এই অলিদের বিরোধিতা করে, আল্লাহ নিজে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেন। হাদিসে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর থেকে বর্ণনা করছেন, আল্লাহ বলেন :

مَنْ عَادَ لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اَذِنْتُهُ لِلْحَرْبِ۔

যে আমার অলিদের সাথে শত্রুতা করে, আমি তাকে যুদ্ধের আহ্বান জানাই।

অবশ্য আল্লাহর সাহায্যকারীগণ সত্যিই আল্লাহর সাহায্যকারী কি না, সত্যি সত্যি আল্লাহকে ভালবাসে কি না এর পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটা ব্যবস্থা আল্লাহ রেখেছেন। এই পরীক্ষায় পাশ করা ছাড়া তিনি কাউকেই অলি বা বন্ধু হিসেবে কবুল করেন না। এই পরীক্ষা সব নবী-রাসূল এবং তাদের সঙ্গী-সাথীদের নেয়া হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে আল্লাহ বিশ্বজোড়া মানুষের ইমামত দান করার আগে চরম পরীক্ষা নিয়েছেন। এসব পরীক্ষায় পাশ করার পরই আল্লাহ ঘোষণা করেছেন : اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا

আমি তোমাকে বিশ্বের সমস্ত মানুষের ঈমাম বা নেতা বানাতে চাই।। (আল বাকারা : ১২৪)

আল্লাহ তায়ালা এভাবে তার সাহায্যকারীদের পরীক্ষা নেয়ার কথা আল কোরআনে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ لا وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ۔

অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করবো যাতে তোমাদের মধ্যে কারা সংগ্রামী ও ধৈর্য ধারণকারী তা জেনে নিতে পারি এবং তোমাদের অবস্থা যাচাই করতে পারি। (মুহাম্মদ : ৩১)

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لاَيُفْتَنُوْنَ۔

মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, আমরা ঈমান এনেছি এতটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে– তাদের পরীক্ষা নেয়া হবে না? (আল আনকাবূত : ২)

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاۤءُ وَالضَّرَّاۤءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ط اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ـ

তোমরা কি ভেবে নিয়েছ যে, এমনিতেই বেহেশতে পৌছে যাবে? অথচ তোমাদের পূর্বের লোকদের সামনে যেসব কঠিন মুহূর্তে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় এসেছে তারতো কিছুই এখনও তোমাদের সামনে আসেনি। তাদের উপর কঠিন থেকে কঠিনতর মুহূর্ত এসেছে– বিপদ-মুছিবত তাদেরকে প্রকম্পিত করে তুলেছে– এমন কি নবী রাসূলগণ ও তাদের সাথীগণ সমস্বরে বলে উঠেছে– আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে। (আল বাকারা : ২১৪)

এভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আল্লাহ তায়ালা তার সব নেক বান্দাদেরই নিয়েছেন এবং নিয়ে থাকেন। তাই হাদিসে বলা হয়েছে :

اَشَدُّ الْبَلَاءِ الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَالُ فَالْاَمْثَالُ ـ

সবচেয়ে বেশী বিপদ-মুছিবত তথা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন আম্বিয়ায়ে কেরামগণ। এরপর তাদের অনুসরণের ক্ষেত্রে যারা যত বেশী অগ্রসর তাদেরকে তত বেশী বিপদ-মুছিবত বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

এভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা কি চান তাও পরিষ্কার করে বলেছেন :

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ط وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ج وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاۤءَ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ـ

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِيْنَ-

তোমাদের যদিও বা কিছুটা ক্ষতি, কিছুটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে– তাতে কি আর আসে যায়, তোমাদের প্রতিপক্ষেরও তো অনুরূপ বিপর্যয় এসেছে। এই দিনসমূহ (সুদিন বা দুর্দিন) তো আমারই হাতে। আমি মানুষের মাঝে তা আবর্তিত করে থাকি। এভাবে আল্লাহ জেনে নিতে চান, কারা সত্যিকারের ঈমানদার এবং তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। আল্লাহ জালেমদের পছন্দ করেন না। তিনি আরও চান, ঈমানদারদের মধ্যে খাঁটি-অখাঁটি হিসেবে ছাঁটাই-বাছাই করতে এবং কুফরী শক্তির মূলোৎপাটন করতে। (আলে ইমরান : ১৪০-১৪১)

আল্লাহ পাকের উক্ত ঘোষণার আলোকে পরিষ্কারভাবে আমরা বুঝতে পারি, পরীক্ষার মাধ্যমে প্রথমতঃ ঈমানের দাবীর সত্যতা ও যথার্থতা প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়তঃ কিছু লোক আল্লাহর দরবারে শহীদ হিসেবে মকবুল হয়। তৃতীয়তঃ শহীদদের সাথীদের এক অংশ এই কাফেলা থেকে ছিটকে পড়ে। চতুর্থতঃ পরীক্ষার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে শহীদদের সাথীদের মধ্য থেকে যারা ছবর ও ইস্তেকামাতের পরাকাষ্ঠা দেখাতে সক্ষম হয়– আল্লাহ তাদের হাতে দ্বীন ইসলামের বিজয় পতাকা দান করেন এবং তাদের মাধ্যমে কুফরী শক্তির মূলোৎপাটন করে দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের পথে বাধা-প্রতিবন্ধকতা, বিপদ-মুছিবত যা আসে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপকরণ হিসেবেই আসে। তাই যাদের দিলে সঠিক ঈমানের আলো আছে, তারা এসব মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করে না।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ-

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া, নির্দেশ ছাড়া তো কোন বিপদ মুছিবত আসতেই পারে না। আর যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে আল্লাহ তাদের দিলকে সঠিক হেদায়াত দান করেন। (আত তাগাবুন : ১১)

বস্তুত ইসলাম প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলনের পথে এমন একটা মুহূর্ত তো আসতেই হবে যেখানে পৌঁছে আন্দোলনের কর্মীগণ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আর কোন কিছুর উপরই নির্ভর করবে না, করতে পারবে না। এমনি মুহূর্তেই আল্লাহর

নৈকট্য লাভের মুহূর্ত– মেরাজের মুহূর্ত। ইসলামী আন্দোলনের কাফেলার সঙ্গী-সাথীগণ যখন এই পর্যায়ে উপনীত হতে সক্ষম হয়, তখনই আল্লাহ তায়ালা তাদের বিজয় দানের ফায়সালা করেন।

এ কাজে শরীক হওয়ার জন্যেও আল্লাহর অনুমোদন প্রয়োজন

ইসলামী আন্দোলনের কাজটা আল্লাহর কাজ। সুতরাং এই কাজে শরীক হতে পারাটাও আল্লাহর অনুমোদন সাপেক্ষ। অবশ্য যারাই নিষ্ঠার সাথে এই পথে চলার সিদ্ধান্ত নেয়, আল্লাহ তাদের সিদ্ধান্তকে কবুল করেন।

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ـ

যারাই আমার পথে সংগ্রাম-সাধনায় আত্মনিয়োগ করে আমি তাদেরকে পথ দেখিয়ে থাকি। (আল আনকাবূত : ৬৯)

আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সাথে যারা এই কাজে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেছেন : هُوَ اجْتَبَاكُمْ ـ

তিনি তোমাদেরকে এই কাজের জন্যে বাছাই করেছেন। (আল হাজ্জ)

مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَأْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ لا اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ز يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَايَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ط ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ـ

তোমাদের মধ্য থেকে যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তাদের পরিবর্তে আল্লাহ অন্য কোন সম্প্রদায়কে এই কাজের দায়িত্ব দেবেন– তারা আল্লাহকে ভালবাসবে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসবেন, তারা মুমিনদের প্রতি হবে দয়ালু আর কাফিরদের প্রতি হবে কঠোর। তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে– কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদের পরোয়া করবে না.... এটাতো আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানী, তিনি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি এই বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ তো গভীর জ্ঞানের অধিকারী। (আল মায়েদা : ৫৪)

উক্ত ঘোষণায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলনের সুযোগ পাওয়াটা আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানীর উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ গভীর জ্ঞানের

অধিকারী, আল্লাহ জেনে বুঝেই এ মেহেরবানী প্রদর্শন করে থাকেন। কারা আল্লাহর এই বিশেষ মেহেরবানী পাওয়ার যোগ্য, তাও আল্লাহ পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন– যারা আল্লাহকে ভালবাসবে এবং আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার মত কাজ করে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হবে, যারা এই পথে প্রাণান্তকর সংগ্রাম করবে এবং এই পথে চলতে গিয়ে কোন প্রকারের বাধা, বিপত্তি, নিন্দাবাদ, জুলুম, নির্যাতন কোন কিছুর পরোয়া করবে না অর্থাৎ দুনিয়ায় সবকিছু থেকে বেপরোয়া হতে পারবে, তাদেরকেই আল্লাহ এই কাজের জন্যে যথাযোগ্য পাত্র হিসেবে গণ্য করে গ্রহণ করবেন।

এই কাজের সুযোগ পাওয়া যেমন আল্লাহর মেহেরবানী তেমনি এই কাজের উপর টিকে থাকাও আল্লাহর মেহেরবানীর উপর নির্ভরশীল। এই কারণেই আল্লাহ তায়ালা দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন :

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ

হে আমাদের রব! একবার হেদায়াত দানের পর আবার আমাদের দিলকে বাঁকা পথে নিও না। তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে খাছ রহমত দান কর, তুমিই মহান দাতা। (আলে ইমরান : ৮)

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্যে একটি সতর্কবাণী

যে আন্দোলনের কাজ অতীতে আঞ্জাম দিয়েছেন নবী রাসূলগণ, যে আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও নবী রাসূলদের সার্থক উত্তরসূরীগণ, আল কোরআন যাদেরকে অভিহিত করেছে সিদ্দিকীন, সালেহীন এবং শুহাদা হিসেবে, সেই আন্দোলনে শরীক হতে পারা আল্লাহর একটি বিশেষ মেহেরবানী ছাড়া আর কিছুই নয়। এই কথা আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি। আল্লাহর এই মেহেরবানী যারা পায়, তারা নিঃসন্দেহে বড় ভাগ্যবান। আল্লাহর এই বিশেষ মেহেরবানীর দাবী হলো, আল্লাহর প্রতি আরও বেশী বেশী কৃতজ্ঞ হওয়ার প্রয়াস চালানো। আর সেই কৃতজ্ঞতার দাবী হলো, আল্লাহর এই মেহেরবনীর পূর্ণ সদ্ব্যবহারের আপ্রাণ চেষ্টা চালানো। নিজের যোগ্যতা প্রতিভার সবটুকু এই কাজে লাগিয়ে দেয়া। এইভাবে যতক্ষণ কোন একটা দলের বা সম্প্রদায়ের লোকেরা সম্মিলিতভাবে এবং নিষ্ঠার সাথে এই দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত থাকে ততক্ষণ

আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে থাকেন, তাদের জন্যে পথ খুলতে থাকেন

কিন্তু যখন ইসলামী আন্দোলনে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ সম্মিলিতভাবে আদর্শচ্যুতির শিকার হয়ে যায়, কঠিন এই দায়িত্বের অনুভূতি হারিয়ে ফেলে, আল কোরআনের ভাষায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তখন তাদেরকে চরম দুর্ভাগ্য কুড়াতে হয়। তাদেরকে আল্লাহ তার এই বিশেষ মেহেরবানী থেকে বঞ্চিত করেন। তাদের পরিবর্তে অন্য কোন দল বা সম্প্রদায়কে এই কাজের সুযোগ করে দেন। কারণ আল্লাহ তার দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজের ব্যাপারে কোন দল বা গোষ্ঠী বিশেষকে ঠিকাদারী দেননি, কোন দল বা গোষ্ঠীর কাজ করা না করার উপর তার দ্বীনের বিজয়ী হওয়া না হওয়াকে নির্ভরশীলও করেননি। আল্লাহতো তার দ্বীনকে বিজয়ী করবেনই। সুতরাং যারা আজ এই কাজের সুযোগ পেয়েছে তারা যদি চরম উদাসীনতার পরিচয় দেয়, অযোগ্যতা ও নিষ্ক্রিয়তার পরিচয় দেয় তাহলে দায়িত্বহীনতা ও নিষ্ক্রিয়তার কারণে আল্লাহ তার দ্বীনের বিজয়কে ঠেকিয়ে রাখবেন না, বরং তাদের পরিবর্তে অন্যদেরকে এই কাজের সুযোগ করে দেবেন যারা তাদের মত হবে না। এই মূল বিষয়টি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের গভীরভাবে ভেবে দেখার মত।

অনেকেই মনে করে থাকে, আন্দোলনে অংশ নিয়ে, সময় দিয়ে, অর্থ দিয়ে তারা আন্দোলনের প্রতি মেহেরবানী করছেন। তাদের বেশ অবদান আছে, আন্দোলনকে দেয়ার মত অনেক অনেক যোগ্যতার অধিকারী তারা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরনের লোকদের মনোভাব ও মানসিকতাকে সামনে রেখেই তো আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন :

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوْا ط قُلْ لاَتَمُنُّوْا عَلَىَّ إِسْلاَمَكُمْ ، بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ.

তারা ইসলাম কবুল করে যেন আপনার প্রতি অনুগ্রহ করে– এই মর্মে তারা খোটা দেওয়ার প্রয়াস পায়। আপনি বলে দিন, বরং ঈমানের পথ দেখিয়ে আল্লাহই তোমাদের প্রতি ইহসান করেছেন, যদি তোমরা সত্যি সত্যি ঈমানদার হয়ে থাক। (আল হুজুরাত : ১৭)

আল্লাহর এই বিশেষ অনুগ্রহের অনিবার্য দাবী - এর সদ্ব্যবহারের প্রতিদান এবং অপব্যবহারের পরিণাম সম্পর্কে সদা জাগ্রত ও সচেতন থাকতে হবে। এই দায়িত্ব পালনে গভীর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা দেখাতে হবে। সুবিধাবাদী মনোভাব ও

আচরণ থেকে ব্যক্তি ও সমষ্টিকে মুক্ত রাখার সযত্ন প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অন্যথায় এই সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যে পরিণত হবে। দুনিয়াতেও লাঞ্ছনা পোহাতে হবে। আখেরাতেও কঠোরতম শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি-পরিণাম থেকে বাঁচতে হলে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের কাজ করার সুযোগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে, ভাগ্যবান ব্যক্তিদেরকে তাদের চলার পথে আল্লাহর সতর্ক সংকেতগুলোও সব সময় সামনে রাখতে হবে। আল্লাহর এই সতর্কবানী সূরায়ে আল মায়েদায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ لا اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ز يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَايَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَاۤئِمٍ ط ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ-

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহর দ্বীন থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে (দ্বীন কায়েমের সংগ্রাম থেকে পিছুটান দেবে তারা যেন জেনে নেয়) আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে এই কাজের সুযোগ করে দেবেন। তাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি হবে রহমদিল এবং কাফেরদের মোকাবিলায় হবে কঠোর। তারা সংগ্রাম করে যাবে আল্লাহর পথে। কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদের পরোয়া করবে না– এটাতো হবে আল্লাহ তায়ালারই অনুগ্রহ– তিনি যাকে চান এভাবে অনুগ্রহ প্রদর্শন করে থাকেন। তিনি তো সীমাহীন জ্ঞানের অধিকারী। (আল মায়েদা : ৫৪)

সূরায়ে তাওবায় এই সতর্ক সংকেত একটু ভিন্ন সুরে ধ্বনিত হয়েছে– আল্লাহর পথে যুদ্ধে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এই আহ্বানে সাড়া দিতে যারা গড়িমসি করছে তাদের লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ

الْاٰخِرَةِ ج فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ قَلِيْلٌ ـ اِلاَّ تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَاتَضُرُّوْهُ شَيْئًا ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়তে বলা হয় তখন তোমরা মাটি আঁকড়ে পড়ে থাক। তোমরা কি দুনিয়ার জিন্দেগী নিয়েই খুশী থাকতে চাও অথচ দুনিয়ার এই পার্থিব জীবনতো আখেরাতের তুলনায় কিছুই নয়। যদি তোমরা বের না হও তাহলে (এই কাজের জন্যে) তোমাদের জায়গায় আল্লাহ অন্য জাতিকে সুযোগ করে দেবেন। তোমরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তো সবকিছুর উপর ক্ষমতাশালী এবং কর্তৃত্বের অধিকারী। (আত তাওবা : ৩৮-৩৯)

সূরায়ে মুহাম্মাদ বা সূরায়ে কিতালে এই সতর্কবাণী এসেছে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে লিপ্ত ব্যক্তিদের মন-মানসিকতার সার্বিক বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে। কিতালের নির্দেশ বাস্তবায়নে যাদের মনে দ্বিধা সংশয় ছিল, তাদের এই দ্বিধা সংশয় সম্পর্কে একদিকে সতর্ক করা হয়েছে। সেই সাথে যে কুফরী শক্তির ভীতি তাদের মনে ছিল, সেই কুফরী শক্তির অসারতা, পরিণামে তাদের ব্যর্থতা অনিবার্য– এই কথা সুস্পষ্টভাবে বলার পর আল্লাহ ঘোষণা করেন :

فَلاَ تَهِنُوْا وَتَدْعُوْا اِلَى السَّلْمِ ق وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ق وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ـ اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ط وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلاَ يَسْئَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ـ اِنْ يَّسْئَلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ ـ هٰاَنْتُمْ هٰؤُلَاۤءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ج وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ط وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاۤءُ ج وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا

غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ -

অতএব তোমরা ভগ্নোৎসাহ হবে না, আপোষ করতে যাবে না, তোমরাই বিজয়ী হবে। আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। তিনি তোমাদের আমল নষ্ট বা ব্যর্থ হতে দেবেন না। এই দুনিয়ার জীবন একটা খেল তামাশা বৈ আর কিছুই নয়। যদি তোমরা ঈমানদার হও এবং তাকওয়ার অধিকারী হও তাহলে তিনি তোমাদের যথার্থ প্রতিদান দেবেন। তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের মাল চাইবেন না। যদি কখনও তিনি মাল চেয়ে বসেন এবং সবটা চান তাহলে তোমরা কৃপণতা প্রদর্শন করবে। এইভাবে তিনি তোমাদের মনের রোগব্যাধি প্রকাশ করে ছাড়বেন। দেখ, তোমাদেরকে আল্লাহর পথে মাল খরচ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, এমতাবস্থায় তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বখিলি করছে। প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের সাথেই এই বখিলির আচরণ করছে। (এর পরিণামে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে) আল্লাহ তো (অশেষ ভাণ্ডারের অধিকারী) কারো মুখাপেক্ষী নন বরং তোমরাই তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী। যদি তোমরা এই কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আল্লাহ তোমাদের জায়গায় অন্য কাউকে নিয়ে আসবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না। (মুহাম্মদ : ৩৫-৩৮)

লক্ষণীয়, এই সতর্ক ও সাবধান সংকেত প্রত্যক্ষভাবে তাদেরকে শুনানো হয়েছে, যারা আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে সরাসরি দাওয়াত পেয়েছিল, তাঁর পরিচালনায় চলছিল। এমনকি তাঁর পেছনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বা জামায়াত আদায় করছিল। আর আমরা তাদের তুলনায় কি? অতএব আল্লাহর এই সতর্ক সংকেতকে ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদেরকে সব সময় ব্যক্তিগতভাবেও সামনে রাখতে হবে, সামষ্টিকভাবেও সামনে রাখতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামী আন্দোলনের সাফল্য

আল্লাহর দ্বীনের বিপরীত মতাদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত আন্দোলনের মৌলিক পার্থক্য সর্বত্রই সুস্পষ্ট। এই পার্থক্যের সূচনা হয় উভয়বিধ আন্দোলনের ধারক বাহকদের আকিদা বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে দু'টি বিপরীতমুখী ধারণা ও বিশ্বাস আল্লাহর পথের আন্দোলন ও তাগুত বা গায়রুল্লাহর পথের আন্দোলনকে পরিপূর্ণরূপে দু'টি ভিন্ন খাতে পরিচালিত ও প্রবাহিত করে থাকে। এই পার্থক্য যেমন সূচিত হয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তেমনি পার্থক্য সূচিত হয় কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রেও। পার্থক্য সূচিত হয় কর্মপদ্ধতি ও কর্মকৌশলের ক্ষেত্রেও। এভাবে আন্দোলনের চূড়ান্ত ফলাফল সফলতা ও ব্যর্থতার ক্ষেত্রেও অনৈসলামিক আন্দোলন ও ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল পার্থক্য।

ইসলামী আন্দোলন যার জন্যে, যার নির্দেশে, এই সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ণয় করতে হবে তার দেয়া মানদণ্ডেই। ইসলামী আন্দোলন আল্লাহর পথের আন্দোলন, আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের আন্দোলন, আল্লাহর নির্দেশ পালনের আন্দোলন। সুতরাং এর সাফল্যের সংজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে তাঁর কাছ থেকেই। তিনি সূরায়ে সফের মাধ্যমে আল্লাহর পথে মাল দিয়ে জান দিয়ে জিহাদের যে নির্দেশ দিয়েছেন তা তো আখেরাতে আজাবে আলীম থেকে, কষ্টদায়ক শাস্তি থেকে বাঁচার উপায় হিসেবেই দিয়েছেন। অতঃপর এই কাজের দুটো প্রতিদানের কথা উল্লেখ করেছেন।

এক :

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং এমন জান্নাতে স্থান দেবেন যার পাদদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে। সদা বসন্ত বিরাজমান জান্নাতে উত্তম ঘর তোমাদের দান করা হবে। এটাই হলো সবচেয়ে বড় সাফল্য। (আস সফ : ১২)

আল্লাহ পাকের এই ঘোষণা থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি, আখেরাতের কামিয়াবীই হলো বড় কামিয়াবী। ইসলামী আন্দোলনের ব্যক্তিদের সামনে এটাই হতে হবে প্রধান ও মুখ্য বিষয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে জাগতিকভাবে কোন একটা স্থানে ইসলামী আন্দোলন সফল হলে বা বিজয়ী হলেও আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যদি আদালতে আখেরাতে আল্লাহর দরবারে সাফল্যের সনদ না পায় তা হলে ঐ ব্যক্তিদের আন্দোলন ব্যর্থ বলেই বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে কোথাও ইসলামী আন্দোলন জাগতিকভাবে সফলতা অর্জন নাও করতে পারে। আর আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণ আখেরাতের বিচারে আল্লাহর দরবারে নেককার, আবরার হিসেবে বিবেচিত হয়, আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হয়, তার সন্তোষ লাভে সক্ষম হয়, তাহলে তাদের আন্দোলনকে কামিয়াব বলতে হবে। মনে রাখতে হবে, আল্লাহর ভাষায় এটাই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কামিয়াবী।

দুই :

وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ط نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ-

আর অপর একটি প্রতিদান যা তোমরা কামনা কর, পছন্দ কর, তাও তোমাদেরকে দেয়া হবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাঙ্ক্ষিত সাহায্য ও বিজয় অতি নিকটেই হাসিল হবে। (আস সফ : ১৩)

সূরায়ে নূরে এই দ্বিতীয় পর্যায়ের সাফল্য বা জাগতিক সাফল্যের কথা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একটা ওয়াদা আকারে এসেছে। অবশ্য সে ওয়াদা শর্তহীন নয়। দুটো বড় রকমের শর্তসাপেক্ষ। বলা হয়েছে :

وعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِىْ الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ م بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا.

তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ করবে এমন লোকদের জন্যে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে. তিনি তাদেরকে সেইভাবে দুনিয়ার

খেলাফত (নেতৃত্ব) দান করবেন, যেভাবে পূর্ববর্তী লোকদেরকে খেলাফত দান করা হয়েছে। তাদের জন্যে আল্লাহ যে দ্বীনকে পছন্দ করেছেন সেই দ্বীনকে মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। তাদের বর্তমানের ভয় ও নিরাপত্তাহীন অবস্থা পরিবর্তন করে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করবেন। (আন নূর : ৫৫)

উল্লিখিত আয়াতের আলোকে জাগতিক সাফল্যের চূড়ান্ত রূপ হলো আল্লাহর সাহায্যে খোদাদ্রোহী শক্তিকে নেতৃত্ব কর্তৃত্বের আসন থেকে অপসারিত করে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারা। সেই সাথে তাগুতি শক্তির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা থাকাকালে মানুষের সমাজে যে অরাজকতা ও নৈরাজ্য কায়েম থাকে, মানুষের জানমাল ও ইজ্জত আবরুর নিরাপত্তা সব সময় হুমকীর সম্মুখীন থাকে, সেই অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। হাদিসে রাসূলের আলোকে একজন সুন্দরী নারী অঢেল ধন-সম্পদ ও সোনা-রূপার অলংকারসহ একাকিনী দূর-দূরান্তে সফর করতে পারে, তার জীবন যৌবনের উপরও কোন হামলার ভয় থাকে না, তার সম্পদ লুণ্ঠনের কোন আশঙ্কা থাকে না।

যারা ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবে, তাদের সামনে উভয় প্রকারের সাফল্যই থাকতে হবে। তবে আল্লাহ যেটাকে প্রধান ও মুখ্য সাফল্যরূপে সামনে রেখেছেন সেটাকেই মুখ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে আখেরাতের সাফল্যই যাদের চরম ও পরম কাম্য হবে, আল্লাহ তাদেরকে উভয় ধরনের সাফল্য দান করবেন। কিন্তু দুনিয়ার সাফল্য যাদের মুখ্য কাম্য হবে আখেরাতের সাফল্য হবে গৌণ ও কম গুরুত্বপূর্ণ, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা উভয় জগতে ব্যর্থ করবেন। কারণ দুনিয়ার খেলাফত তো একটা কঠিন আমানত। মানুষের সমাজে সর্বত্র ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার আমানত, সর্বস্তরের জনমানুষের অধিকার সংরক্ষণের আমানত, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের আমানত, মানুষের জানমাল ইজ্জত আবরুর হেফাজতের আমানত। এই আমানতকে তারাই বহন করতে সক্ষম যাদের মন-মগজে দুনিয়ার কোন স্বার্থ চিন্তার স্থান নেই। অবশ্য আখেরাতের এই সাফল্য পাওয়ার পথ দুনিয়ায় নিজেকে এবং আল্লাহর অন্যান্য বান্দাকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে আল্লাহর গোলামী করার সুযোগ করে দেওয়ার চূড়ান্ত প্রচেষ্টার উপরই নির্ভরশীল। সুতরাং আখেরাতের সাফল্যকে মুখ্য ধরে নিয়ে আন্দোলনের জাগতিক সাফল্য কামনা করা দূষণীয় নয়।

ইসলামী আন্দোলন মূলত নবী রাসূলদের পরিচালিত আন্দোলনেরই উত্তরসূরী। সুতরাং নবী রাসূলদের আন্দোলনের ইতিহাসের আলোকে এর সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল্যায়নই যথার্থ মূল্যায়ন। নবী রাসূলগণ সব সময় অহীর মাধ্যমে

সরাসরি আল্লাহর দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। আল্লাহ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে যাদেরকে নবুয়তের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তারা তাদের সময়ে যার যার দেশে সার্বিক বিচারে ছিলেন উত্তম মানুষ, যোগ্যতম নেতা। এর পরও আমরা দেখতে পাই, সব নবীর জীবনে সমাজে নেতৃত্বের পরিবর্তন আসেনি বা দ্বীন বিজয়ী হওয়ার সুযোগ পায়নি। যেমন হযরত নূহ (আ.) সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শ' বছর তার কওমের কাছে দাওয়াত দিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দিয়েছেন, লোকদেরকে একত্রে সমবেত করে দাওয়াত দিয়েছেন, গোপনে দাওয়াত দিয়েছেন, প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া অনেকেই ঈমান আনেনি। তাই বলে হযরত নূহ (আ.) কিন্তু ব্যর্থ হননি।

সত্যের সংগ্রামে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টিকে থাকাই তো সফলতা। সত্যের এই সংগ্রামে ব্যর্থ হয় তারা যারা জাগতিক সাফল্যের বিলম্ব দেখে এবং আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই মনে করে রণে ভঙ্গ দেয়, মাঝ পথে ছিটকে পড়ে। আর ব্যর্থ হয় সেই জাতি বা জনগোষ্ঠী যারা সত্যকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। যেমন হযরত নূহ (আ.) শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দ্বীনের উপর, দ্বীনের দাওয়াতের উপর অটল অবিচল থেকে তিনি কামিয়াব হয়েছেন। আর তার জাতির লোকেরা দুনিয়ায় ধ্বংস হয়েছে, আখেরাতেও রয়েছে তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি।

বনী ইসরাঈলের ইতিহাসে দেখা যায় তারা অনেক নবী রাসূলকেই হত্যা করেছে। তাই বলে এই নিহত বা শহীদ নবী-রাসূলগণ তো ব্যর্থ হননি। বরং এখানেও ব্যর্থ হয়েছে বনী ইসরাঈল। দুনিয়ায় অনেক বড় মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত পাওয়া সত্ত্বেও তারা আজ অভিশপ্ত, দুনিয়ার সর্বত্র ঘৃণিত। এটাই তাদের ব্যর্থতা। তারা আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত, আর মানুষের কাছে ঘৃণিত। পক্ষান্তরে ঐসব শহীদ নবী-রাসূলগণ আল্লাহর কাছে মহা মর্যাদার অধিকারী আর দুনিয়ার সর্বত্র সত্যের সংগ্রামীদের পথিকৃত। আবার অনেক নবীই তাদের জীবনেই এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) নমরুদী ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে শান্তির সমাজ গড়তে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তির নগরী চরম জাহেলী সমাজেও শান্তি নিরাপত্তার স্থান হিসেবে স্বীকৃত ছিল। হযরত ইউসুফ (আ.) রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে মানুষের সমাজে শান্তি ও ইনসাফ কায়েম করতে সক্ষম হয়েছেন। হযরত দাউদ (আ.) জালুতের মত জালেম বাদশাহকে পরাভূত করে খেলাফতের অধিকারী হয়েছেন, ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নমুনা উপস্থাপন করেছেন। তার সন্তান হিসেবে হযরত সোলাইমান (আ.) সেই শান্তির সমাজকে আরও

সম্প্রসারিত করেছেন। হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনী শক্তির পতন ঘটিয়ে বনী ইসরাঈলকে তথা সেই সময়ের জনমানুষকে স্বৈরশাসনের কবল থেকে মুক্ত করেছেন। সর্বশেষে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এই দুনিয়ায় আসবে, সবার জন্যে জীবন্ত নমুনা হিসেবে শেষ নবীর আন্দোলনের সর্বাঙ্গীন সাফল্যের রূপ আল্লাহ তায়ালা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এভাবে জাগতিক সাফল্য আসা না আসার ব্যাপারটা নিরঙ্কুশভাবে একমাত্র আল্লাহরই হাতে। তবে আল্লাহ এই ব্যাপারে একটা নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। আল্লাহর দেয়া সেই নিয়মের অধীনেই এইরূপ ফলাফল সংঘটিত হয়ে থাকে।

সেই নিয়মটা হলো :

এক : আল্লাহর দ্বীনের ভিত্তিতে মানুষের সমাজ পরিচালনার উপযুক্ত একদল লোক তৈরি হতে হবে।

দুই : দেশের, সমাজের মানুষের মধ্যে সেটা সবাই না হলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ আল্লাহর দ্বীনকে তাদের জন্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চাইতে হবে।

শেষ নবী মক্কার ১৩ বছরের সাধনায় লোক তৈরি করেছেন, কিন্তু মক্কার জনগণ তখনও এটা চায়নি তাই মক্কায় তখন তখনই এটা কায়েম হয়নি। মদিনার জনগণের প্রভাবশালী এবং উল্লেখযোগ্য অংশ আল্লাহর দ্বীনকে কবুল করতে রাজী হয়েছে, আল্লাহর রাসূলকে নেতা মেনেছে, তাই সেখানে দ্বীন কায়েম হয়েছে, জাগতিক সাফল্য এসেছে। আল্লাহর ঘোষণা :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.

আল্লাহ ততক্ষণ কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে চেষ্টা করবে। (আর রা'দ : ১১)

এভাবে একটা দেশে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি নিম্নলিখিত কয়েকটি রূপেই হতে পারে :

এক : দেশ, জাতি ও সমাজ পরিচালনা করার মত পর্যাপ্ত পরিমাণে যোগ্য, সৎ, খোদাভীরু লোক তৈরি হওয়ার সাথে সাথে দেশের জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য অংশের বা অধিকাংশের সমর্থন-সহযোগিতার ভিত্তিতে ইসলাম বিজয়ী হবে।

দুই : লোক তৈরি হবে কিন্তু জনগণের উল্লেখযোগ্য অংশের সমর্থন পাবে না। এই সমর্থন না পাওয়ার ফলে আন্দোলনকারীদের সামনে তিনটি অবস্থা আসতে পারে।

(১) তাদের সবাইকে না হলেও উল্লেখযোগ্য অংশকে শহীদ করা হবে। যেমন হযরত হোসাইন (রা.) ও তার সাথীদের ব্যাপারে ঘটেছে। (২) তারা দেশ থেকে বহিষ্কৃত হবে। অথবা (৩) দেশের মধ্যেই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থাকবে।

প্রথম রূপটিকে তো সবাই সাফল্য হিসেবেই বিবেচনা করবে। কিন্তু এই সাফল্য ঝুঁকিবিহীন নয়, ইসলামী খেলাফতের মর্যাদা রক্ষা করতে পারা না পারার উপরই এর চূড়ান্ত ফলাফল নির্ভর করে। দ্বিতীয় রূপটি প্রথমটি অর্থাৎ শাহাদাতবরণ আপাত-দৃষ্টিতে ব্যর্থতা মনে হলেও সবচেয়ে ঝুঁকিবিহীন সাফল্য। সত্যি সত্যি ঈমানের সাথে কেউ এই পথে শাহাদত বরণ করে থাকলে তার চেয়ে পরম সাফল্যের অধিকারী আর কেউ নেই, তার চেয়ে বড় ভাগ্যবান আর কেউ নেই। আল্লাহর রাসূলের সুস্পষ্ট ঘোষণা :

مَوْتٌ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ فِى مَعْصِيَةِ اللّٰهِ.

আল্লাহর হুকুম পালনে মৃত্যুবরণ করা, তার নাফরমানীর মধ্যে বেঁচে থাকার চেয়ে উত্তম। (আল-হাদিস)

দ্বিতীয় পর্যায়ের দুই এবং তিন নম্বর রূপটিও বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। দেশ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর সর্বস্ব ত্যাগ করতে বাধ্য হবার পর অথবা দেশের মাঝেই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থাকার কারণে যদি কারও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, আদর্শিক বিপর্যয় ঘটে, হতাশা নিরাশার কারণে হাত পা ছেড়ে বসে পড়ে অথবা বাতিল শক্তির সাথে আপোষে চলে যায় বা জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার সাথে আপোষ করে বসে, তাহলে তাকে বা তাদেরকে অবশ্যই ব্যর্থ বলতে হবে। কিন্তু এরপরও যারা সবর ও ইস্তেকামাতের পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারে, তাদের পরাজয় নেই, ব্যর্থতা নেই, বরং তাদেরকে যারা বহিষ্কার করে, কোণঠাসা করে পরিণামে তারাই ব্যর্থ হয়, তারাই পরাজিত হয়।

জাগতিক সাফল্যের কোরআনিক শর্তাবলী

সূরায়ে সফে আল্লাহ তায়ালা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জাগতিক সাফল্যের শুভ সংবাদ দেওয়ার পরেই ঘোষণা করেছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْآ اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ
مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّنَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ط قَالَ الْحَوَارِيُّنَ

نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ ۢ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظَاهِرِيْنَ۔

তোমরা যারা ঈমান এনেছো আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও। যেমন ঈসা (আ.) হাওয়ারীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ উত্তরে বলেছিল, আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। এই মুহূর্তে বনী ইসরাঈলের একটা অংশ ঈমান আনল। আর একটা অংশ কুফরী করল। তারপর আমি ঈমানদারদেরকে তাদের দুশমনদের মোকাবিলায় সাহায্য করলাম, ফলে তারাই বিজয়ী হলো। (আস সফ : ১৪)

এই বিজয় কিভাবে এসেছিল? একটা হাদিসে দেখা যায়, আল্লাহর রাসূল (সা.) হযরত ঈসা (আ.) এর সাথীদের ন্যায় ভূমিকা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। হাদিসের বর্ণনা নিম্নরূপ :

একদা রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামদের বলেছিলেন, এমন একটা সময় আসবে যখন আমার উম্মতের রাজনৈতিক অবস্থা বিকৃত হয়ে যাবে। এমন লোকেরা ক্ষমতায় থাকবে যদি তাদের অনুসরণ করা হয়, তাহলে গোমরাহ হবে। আর যদি তাদের বিরোধিতা করা হয়, তাহলে গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে। এরপর সাহাবায়ে কেরামগণ বলে উঠলেন–

كَيْفَ نَصْنَعُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟

এমন অবস্থায় আমরা কি করব, হে আল্লাহর রাসূল। উত্তরে রাসূল (সা.) বললেন :

كَمَا صَنَعَ اَصْحَابُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، هُمْ قُتِلُوْا بِالْمِنْشَارِ نُصِبُوْا عَلَى الشَّنْقِ، مَوْتُ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ.

তোমরাই সেই ভূমিকা পালন করবে যে ভূমিকা হযরত ঈসা (আ.) এর সাথীগণ পালন করেছিলেন। তাদেরকে করাত দিয়ে চিরে হত্যা করা হয়েছে। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে, (তবুও তারা আপোষ করেনি, নতি স্বীকার করেনি)

এভাবে আল্লাহর আনুগত্যের মাঝে মৃত্যু বরং নাফরমানীর মাঝে বেঁচে থাকার চেয়ে উত্তম।

এভাবে একদল নিবেদিতপ্রাণ মর্দে মুমিন, মর্দে মুজাহিদের চূড়ান্ত ত্যাগ কোরবানীর রক্ত পিচ্ছিল পথ বেয়েই এই সাফল্য অতীতে এসেছে– এখনও আসতে পারে, আগামীতেও আসবে ইনশাআল্লাহ।

সূরায়ে আন্ নূরের যে স্থানে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার খেলাফত দানের ওয়াদা করেছেন, সেখানেই এই খেলাফত যারা পেতে চায় তাদেরকে কতিপয় নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে প্রণিধানযোগ্য।

يَعْبُدُوْنَنِيْ وَلاَيُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا ط وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ـ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ. لاَتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِيْ الاَرْضِ ج وَمَاْوَاهُمُ النَّارُ ط وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ـ

অতএব তারা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে এবং আমার সাথে আর কাউকে শরীক করবে না। আর যারা এরপরেও না-শুকরী করবে তারা তো ফাসেক। নামাজ কায়েম কর, জাকাত আদায় কর এবং রাসূলের এতায়াত কর। আশা করা যায় তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে। যারা কুফরী করছে তাদের ব্যাপারে এমন ভুল ধারণা পোষণ করবে না যে, তারা আল্লাহকে অপারগ করে ফেলবে। তাদের শেষ ঠিকানা জাহান্নাম। আর কতই না জঘন্য সেই বাসস্থান। (আন নূর : ৫৫-৫৭)

এখানে একদিকে নির্ভেজাল তাওহীদের অনুসরণ, সর্বপ্রকারের শিরক বর্জন, আল্লাহর প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের, অকৃতজ্ঞতা থেকে বেঁচে থাকার এবং নামাজ কায়েম ও জাকাত আদায়ের নির্দেশের পাশে মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতির জন্যে কুফরী শক্তির অসারতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পোষণের তাকিদ করা হয়েছে। তাদের শক্তি আপাত-দৃষ্টিতে যত বেশীই মনে হোক না কেন তবুও তারা দুর্জয় শক্তির অধিকারী নয়। এই কথাটি আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র ব্যক্ত করেছেন :

وَمَنْ لاَّيُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِيْ الاَرْضِ.

যারা আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেয় না– তারা এই দুনিয়ার কোন দুর্জয় শক্তির অধিকারী নয়। (আল আহকাফ : ৩২)

যার সারকথা, দায়ী আন্দোলনকারী নিছক জাগতিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে লাভ ক্ষতির হিসেব কষবে না বরং আল্লাহর শক্তির উপর ভরসা করে, তার ওয়াদার প্রতি একিন রেখে বিজয়ের পথে পা বাড়াবে।

সূরায়ে মুজাদালায় আল্লাহ তায়ালা হিজবুশশায়তানের ব্যর্থতার নিশ্চিত ঘোষণা ও ঈমানদারদের বিজয়ের দ্ব্যর্থহীন আশ্বাস দিয়েছেন :

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ ط اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ. لَاتَجِدُ
قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَاۤدُّوْنَ مَنْ حَاۤدَّ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْاۤ اٰبَاۤءَهُمْ اَوْ اَبْنَاۤءَ هُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ
اَوْعَشِيْرَتَهُمْ ط اُوْلٰۤئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ
بِرُوْحٍ مِّنْهُ ط وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ
خَالِدِيْنَ فِيْهَا ط رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط اُوْلٰۤئِكَ
حِزْبُ اللّٰهِ ط اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে, আমি এবং আমার রাসূলই বিজয়ী হব। বাস্তবিকই আল্লাহ তায়ালা পরম পরাক্রমশালী। তোমরা কখনই এমনটি পাবে না যে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছে, তারা এমন লোকদের সাথে মহব্বতের সম্পর্ক রাখে, যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতা করে। হোক না তারা তাদের বাপ, বেটা, ভাই অথবা তাদের বংশের কেউ। এরা তো এমন ভাগ্যবান লোক যাদের দিলে আল্লাহ তায়ালা সুদৃঢ় ঈমান দান করেছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে একটা রূহ দ্বারা তাকে শক্তি দান করেছেন– আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতে স্থান দেবেন যার পাদদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তোমরা ভাল করে জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সাফল্যমণ্ডিত হবে। (আল মুজাদালা : ২১-২২)

আল্লাহ তায়ালার এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে আমরা ছয়টি জিনিস পাই, যার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দল হওয়া যায় এবং সকল বাধা-প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে, সকল প্রকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আন্দোলনকে বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌছান যায় আল্লাহর সাহায্যে।

এক : আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই বিজয়ী হবেন, শয়তানী শক্তিকে পরিণামে পর্যুদস্ত ও বিপর্যস্ত হতেই হবে। আল্লাহর এই ওয়াদার প্রতি, আল্লাহর এই ঘোষণার প্রতি পাকাপোক্ত একিন পোষণ করতে হবে।

দুই আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের দুশমনী করে এমন লোক পরম আপনজন, নিকটাত্মীয় হলেও তাদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা যাবে না।

তিন নিছক ঈমানের দাবী নয়– এমন ঈমান যা আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বীকৃত, আল্লাহর বিশেষ তৌফিকের ফলে লব্ধ– এমন ঈমানের অধিকারী হতে হবে।

চার : আল্লাহ প্রদত্ত রূহানী শক্তির বলে বলীয়ান হতে হবে।

পাঁচ : আল্লাহর রেজামন্দি লাভে সক্ষম হতে হবে।

ছয় : আল্লাহর যাবতীয় ফায়সালা খুশিমনে ও দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করার মত মন-মানসিকতার অধিকারী হতে হবে।

জাগতিক প্রস্তুতি গ্রহণ ও শক্তি অর্জনের পাশাপাশি কোরআনিক এই শর্তগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে। তাহলেই ইসলামী আন্দোলনের জাগতিক সাফল্য আশা করা যেতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়
ইসলামী সংগঠন

সংগঠনের অর্থ ও সংজ্ঞা

সংগঠন শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ Organisation যার শাব্দিক অর্থ বিভিন্ন Organকে একত্রিত করণ, গ্রন্থায়ন ও একীভূতকরণ বা আত্মীকরণ। মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও এক একটি Organ বলা হয়। মানবদেহের এই ভিন্ন ভিন্ন Organ গুলোর গ্রন্থায়ন ও একীভূতকরণের রূপটাই সংগঠন বা Organisation-এর একটা জীবন্ত রূপ। মানব দেহের প্রতিটি সেল, প্রতিটি অণু পরমাণু একটা নিয়মের অধীনে সুশৃঙ্খলভাবে যার যার কাজ সম্পাদন করে যাচ্ছে। মানুষের দৈহিক অবয়বগুলোর বিভিন্নমুখী কার্যক্রমের প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব, এখানে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ আছে। আবার কাজের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা আছে, পরস্পরের সাথে অদ্ভুত রকমের সহযোগিতা আছে। মন-মগজের চিন্তা-ভাবনা কল্পনা ও সিদ্ধান্তের প্রতি দেহের বিভিন্ন Organ দ্রুত সমর্থন-সহযোগিতা প্রদর্শন করে। তেমনি দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অভাব-অভিযোগ, অসুবিধা ইত্যাদির ব্যাপারে দেহরূপ এই সংগঠনের কেন্দ্র অর্থাৎ মন ও মগজ দ্রুত অবহিত হয়।

মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এই একীভূত রূপের অনুকরণে কিছুসংখ্যক মানুষের নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে এক দেহ এক প্রাণ রূপে কাজ করার সামষ্টিক কাঠামোকেই বলা হয় সংগঠন বা Organisation।

মুসলিম জনগোষ্ঠী মূলত একটি সংগঠন, জামায়াত বা Organisation। এই জন্যেই হাদিসে রাসূলে এই জনসমষ্টিকে একটি দেহের সাথে তুলনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ

كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى -

হযরত নূমান বিন বশীর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন– মুমিনদের পারস্পরিক ভালবাসা, দয়া ও সহানুভূতি মানবদেহ সদৃশ। তার কোন অংশ রোগাক্রান্ত হলে সমগ্র দেহ নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে দুর্বল হয়ে পড়ে। (বুখারী ও মুসলিম)

এখানে মুমিনদের পরস্পরের সাথে সম্পর্ক, সংযোগ ও অনুভূতিপ্রবণতার বাঞ্ছিত রূপটা কি হওয়া উচিত, এটা বোঝানোর জন্যেই মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গর পারস্পরিক সম্পর্কের, সংযোগের এবং সহানুভূতির ও সহযোগিতার বাস্তব রূপটি উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

এভাবে মানুষের বিভিন্ন Organকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে যেমন মানবদেহ বেকার ও অচল হওয়ার সাথে সাথে ঐসব Organগুলোও বেকার হয়ে যায়, তেমনি এটা সত্য সমাজবদ্ধ জীব মানুষের বেলায়ও। এই সমাজ একটা দেহ এবং ব্যক্তি মানুষগুলো এই সমাজ দেহের এক একটা Organ। মানব দেহের Organগুলো পরস্পর বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন হলে যেমন দেহ ও Organ সবটাই বেকার হয়ে যায়, তেমনি সমাজ দেহের Organগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লে, ব্যক্তি মানুষগুলোও মানুষের মর্যাদায় থাকতে পারে না এবং এই বক্তিদের সামষ্টিক যে রূপটা সমাজ নামে পরিচিত, সেটাও মানুষের সমাজ নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য থাকে না। সুতরাং সংগঠন মানুষের জন্যে, মানুষের ব্যক্তি ও সামষ্টিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে একটা একান্ত স্বাভাবিক ও অনিবার্য প্রয়োজন।

মানুষের এই সংগঠনের আদর্শ রূপ হবে মানব দেহেরই অনুরূপ। অর্থাৎ দেহের যেমন একটা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ আছে যার মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নির্দেশ দেয়া হয়, সিদ্ধান্ত জানানো হয়, প্রয়োজন পূরণ করা হয়, অভাব অভিযোগ দ্রুত শোনা হয়, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যেমন সুন্দরভাবে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ মেনে চলে আবার যার যার জায়গায় স্বাধীনও বটে, আবার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরস্পরের মধ্যেও একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, সুন্দর আদান-প্রদান মানে team spirit আছে। তেমনি মানুষের সমাজ পরিচালনার জন্যে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা থাকতে হবে। যার কাজ হবে সমাজের,

সমষ্টির ও ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষণ করা। এমনভাবে যেন সমষ্টির স্বার্থ সংরক্ষণ ব্যক্তির স্বার্থ ও স্বাধীনতাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। আবার ব্যক্তির স্বার্থ ও স্বাধীনতা যেন সমষ্টির এবং অন্য ব্যক্তির স্বার্থ ও স্বাধীনতার পরিপন্থী না হয়। এখানে সমাজ ব্যক্তিদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে। ব্যক্তিরা যুগপৎভাবে সমাজের প্রতি এবং পরস্পর একে অপরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে।

মানুষের সমাজের এই রূপটাই আদর্শ রূপ। মানবতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ এমনি একটা পরিবেশ, এমনি একটা সামাজিক কাঠামোতেই সম্ভব হতে পারে। মানুষের এই সহজাত এবং স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাকিদেই মানুষ কোন না কোন প্রক্রিয়ায় সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের প্রয়াস চালিয়ে আসছে। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক কোন না কোন একটা সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, মেনে চলারও চেষ্টা করছে। কিন্তু মানুষের সমাজে বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন গোত্রের, দেশের ও ভাষার মানুষকে এক দেহ, এক প্রাণ হিসেবে গ্রন্থায়নে, আত্মীকরণে– মানুষের মনগড়া কোন প্রচেষ্টাই আজ পর্যন্ত সফল হয়নি, হতে পারছে না। মানুষের তৈরি সমাজ কাঠামো সংগঠন, সংস্থা ভারসাম্যমূলক কোন ব্যবস্থাই মানবজাতিকে উপহার দিতে পারেনি। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। কখনও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তির স্বার্থ ও স্বাধীনতা এতটা খর্ব করেছে যে, তার প্রতিক্রিয়া সমাজকেও প্রভাবিত করেছে। কারণ সমাজ তো ব্যক্তিরই সমষ্টি। আবার কখনও অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা, সামাজিক স্বার্থ ও সমাজের ব্যক্তিদের পারস্পরিক স্বার্থ ও স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করেছে। ফলে কোথাও মনুষ্যত্ব ও মানবতার বিকাশ সাধনের সুযোগ হয়নি। বরং মানুষের সমাজে পাশবিকতা, পৈশাচিকতা ও বর্বরতাকেই লালন করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

পক্ষান্তরে মানবজাতি ইতিহাসের ফাঁকে ফাঁকে সমাজের আদর্শরূপও দেখেছে। যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত নীতি-পদ্ধতির ভিত্তিতে। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) প্রতিষ্ঠিত সমাজ এবং খোলাফায়ে রাশেদীন পরিচালিত সমাজই সর্বকালের সর্বযুগের জন্যে আদর্শ সমাজ ও সংগঠন, যেখানে বিভিন্ন গোত্রের, বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন ভাষার মানুষকে এক দেহ এক প্রাণরূপে গড়ে তোলা হয়েছে। ব্যক্তি স্বার্থ ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করেও সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও ইনসাফ সার্থকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। উল্লিখিত আদর্শ সমাজ সংগঠনের আওতায় মানুষের জীবনে

শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নবী রাসূলগণ সবাই একই ধরনের মৌলিক নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। অবশ্য পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে কর্মকৌশল ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। আজকের বিশ্বের মানবজাতিকে যদি আমরা এক দেহ এক প্রাণরূপে সংগঠিত করতে চাই তাহলে (এবং করতেই হবে) ঐ সব মৌলিক নীতি-পদ্ধতি এবং শেষ নবী (সা.) গৃহীত কর্মকৌশল অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। শেষ নবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সারা বিশ্বের মানুষ আবার খেলাফত আলা মিনহাজিন্নাবুয়াতের সাথে সাক্ষাৎ পাবে এবং নবী রাসূলগণের গৃহীত সেই নিয়ম পদ্ধতির ভিত্তিতে গোটা বিশ্বের মানুষ আবার এক দেহ-মন-প্রাণ হবে। নিখিল বিশ্বে গোটা মানব সমাজের এই বৃহত্তর সমাজ সংগঠনই ইসলামী সংগঠনের মূল লক্ষ্য। আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনসমূহ মূলত এই বৃহত্তর লক্ষ্য পানেই ধাপে ধাপে ও পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হচ্ছে।

ইসলামের সঠিক আকিদা বিশ্বাসের ভিত্তিতে দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতে মুক্তির উদ্দেশ্যে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত কিছু সংখ্যক লোকের সম্মিলিত ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার নাম ইসলামী আন্দোলন, আর এর সামষ্টিক রূপ ও কাঠামোর প্রক্রিয়ার নাম ইসলামী সংগঠন।

ইসলামের সাথে আন্দোলন যেমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, ইসলাম ও আন্দোলন যেমন সম্পূর্ণরূপে এক ও অভিন্ন, ইসলামের সাথে সংগঠনের সম্পর্কও তেমনই। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হওয়ার কারণে সমাজ ও সংগঠন ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। ইসলাম এই মানুষের জন্যে, মানুষের সমাজের জন্যেই। সুতরাং সমাজ সংগঠন ছাড়া, জামায়াতবদ্ধ জীবন ছাড়া ইসলামের অস্তিত্ব কল্পনা করাই সম্ভব নয়। ইসলামী আদর্শের প্রথম ও প্রধান উৎস এবং আল কোরআনের শিক্ষা আলোচনা করলে কোথাও ব্যক্তিগতভাবে ইসলামী জীবন যাপনের সুযাগ দেখা যায় না। আল কোরআনের আহ্বান হয় গোটা মানব জাতির জন্যে, আর না হয় মানুষের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে তাদের সকলের জন্যে। কেবলমাত্র আখেরাতের জবাবদিহির ব্যাপারটা ব্যক্তিগতভাবে হবে। কিন্তু সেই জবাবদিহিতে বাঁচতে হলেও এই দুনিয়ায় সামষ্টিকভাবে দ্বীন মেনে চলার ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন আছে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত আয়াতগুলো বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

হে মানব জাতি! তোমাদের রবের ইবাদত কর, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তোমরা মুক্তিলাভে সক্ষম হও। (আল বাকারা : ২১)

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَّاتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

হে মানবজাতি! তোমরা ভয় কর তোমাদের সেই রবকে যিনি তোমাদেরকে একটি নফস থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের দু'জন হতে অসংখ্য নারীপুরুষ ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহকে ভয় কর এবং আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারেও ভয় কর, এসব ব্যাপারে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। আল্লাহ তোমাদের উপর প্রহরীরূপে আছেন। (আন নিসা : ১)

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ۔

হে মানবজাতি! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্রের ও বংশের অন্তর্ভুক্ত করেছি, যাতে করে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে যারা বেশী খোদাভীরু তারাই আল্লাহর কাছে বেশী মর্যাদাবান। অবশ্যই আল্লাহ জ্ঞানী এবং ওয়াকিবহাল। (আল হুজুরাত : ১৩)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَابَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۔

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, সুদ যা এখন চালু আছে– বর্জন কর যদি হও সত্যিই ঈমানদার। (আল বাকারা : ২৭৮)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۔

হে ঈমানদারগণ! সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুদ খাবে না– আল্লাহকে ভয় কর যাতে করে সাফল্যমণ্ডিত হতে পার। (আলে ইমরান : ১৩০)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۔

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের মাল ভক্ষণ করবে না– হ্যাঁ, যদি পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যৌথ ব্যবসা হয়, সেটা ভিন্ন কথা। (আন নিসা : ২৯)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۔ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۔

হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে এমন একটা ব্যবসার কথা বলব কি যা তোমাদেরকে কঠিন আযাব থেকে মুক্তি দেবে? ঈমান আন আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি। আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে। তোমরা প্রকৃত জ্ঞানী হলে বুঝবে এটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। (আস সফ: ১০-১১)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ ۔

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও। (আস সফ : ১৪)

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَاتَفَرَّقُوْا ۔

তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধর, বিচ্ছিন্ন হবে না। (আলে ইমরান : ১০৩)

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে যারা মানব জাতিকে কল্যাণের পথে আহ্বান জানাবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজে বাধা দেবে, তারাই সফলকাম। (আলে ইমরান : ১০৪)

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ م يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

ঈমানদার নারী পুরুষ পরস্পরের সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষক। তাদের সম্মিলিত দায়িত্ব হলো সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে বাধা দান। তারা নামাজ কায়েম করবে, জাকাত আদায় করবে এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে। তাদের প্রতি সত্বর আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞ। (আত তাওবা : ৭১)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ـ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আর আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা শাসন ক্ষমতার অধিকারী তাদের। (আন নিসা : ৫৯)

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ـ

তোমদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং সৎকর্মশীল হবেন, তাদের প্রতি আল্লাহর ওয়াদা তাদেরকে দুনিয়ার খেলাফত দান করা হবে যেমন তার পূর্ববর্তীদেরকে দান করা হয়েছে। (আন নূর : ৫৫)

ইসলামী আদর্শের দ্বিতীয় উৎস সুন্নাতে রাসূল বা হাদিসে রাসূল। সেখানেও জামায়াতী জিন্দেগীর বাইরে ইসলামের কোন ধারণা খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং এখানে তো বলা হয়েছে মাত্র দু'জন কোথাও ভ্রমণ করলেও তার একজনকে আমীর করে নিয়ে জামায়াতী শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলবে।

আল্লাহর রাসূল জামায়াতী জিন্দেগীর ব্যাপারে আরো সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন নিম্নোক্ত হাদীসটির মাধ্যমে :

عَنِ الْحَارِثِ الاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَللّٰهُ اَمَرَنِىْ بِهِنَّ بِالْجِمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

হযরত হারেস আল আশয়ারী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, রাসূল (সা.) বলেন, আমি পাঁচটি জিনিসের ব্যাপারে তোমাদের আদেশ করছি (অন্য রেওয়ায়েতে আছে, আর আমার আল্লাহ আমাকে এই পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন) (১) জামায়াতবদ্ধ হবে (২) নেতার আদেশ মন দিয়ে শুনবে (৩) নেতার আদেশ মেনে চলবে (৪) আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ বর্জন করবে (৫) আর আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। (আহমদ ও তিরমিজী)

উক্ত হাদিসে একই সাথে ইসলামী আন্দেলন ও সংগঠনে উপাদান, কাঠামো ও কার্যক্রমের মৌলিক কথাগুলো সংক্ষেপে অথচ সুন্দরভাবে বলা হয়েছে।

আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহ বাস্তবায়নে অন্যতম সার্থক ও সফল রূপকার হযরত ওমর ফারুক (রা.) কোরআন ও সুন্নাহর স্পিরিটকে সামনে রেখে ইসলামের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতেও ইসলামের সংজ্ঞার পাশাপাশি ইসলামী জামায়াত বা সংগঠনের উপাদান এবং কাঠামো এসে গেছে। তিনি বলেছেন :

لَااِسْلَامَ اِلاَّ بِجَمَاعَةٍ وَلَاجَمَاعَةَ اِلاَّ بِاِمَارَةٍ وَلَا اِمَارَةَ اِلاَّ بِطَاعَةٍ ـ

জামায়াত ছাড়া ইসলামের কোন অস্তিত্ব নেই। আর নেতৃত্ব ছাড়া জামায়াতের কোন ধারণা করা যায় না। তেমনিভাবে আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্বও অর্থহীন। অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে :

يَدُ اللّٰهِ مع الْجَمَاعَةِ ومَنْ شَذَّ شُذَّ اِلَىْ النَّارِ -

জামায়াতের প্রতি আল্লাহর রহমতের হাত প্রসারিত থাকে। যে জামায়াত ছাড়া একা চলে, সে তো একাকী দোযখের পথেই ধাবিত হয়। (তিরমিজী)

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

যে ব্যক্তি আনুগত্য পরিত্যাগ করে এবং জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম)

সুতরাং আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের ইজমার ভিত্তিতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন ইসলামে জামায়াতবিহীন জীবনের কোন ধারণা নেই। জামায়াতবিহীন মৃত্যুকে তো জাহেলিয়াতের মৃত্যু হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব জামায়াতবদ্ধ হওয়া, জামায়াতবদ্ধ হয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো ফরজ। আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করে এসেছি, দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করা ফরজ আর আন্দোলনের জন্যে সংগঠন অপরিহার্য। কাজেই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অনিবার্য কারণেই ফরজ হতে বাধ্য।

সংগঠনের উপাদান

মানুষের সমাজে কিছু কাজ করার জন্যে যে সব সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, মোটামুটি তার কিছু উপাদান থাকে। যেমন (১) আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি (২) নেতৃত্ব (৩) কর্মীবাহিনী (৪) কর্মক্ষেত্র।

ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনে গড়ে ওঠা সংগঠনেও উল্লিখিত উপাদানগুলো পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান থাকে।

ইসলামী সংগঠন সঠিক ইসলামী আকিদা বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংগঠন বিধায় সে একমাত্র কোরআন সুন্নাহর আদর্শকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে এবং মুমিন জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যা হওয়া উচিত তাকেই সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে। আদর্শ যেমন কোরআন ও সুন্নাহ থেকেই

নেয়, তেমনি সে আদর্শ প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি এবং কর্মপদ্ধতিও কোরআন ও সুন্নাহ থেকেই গ্রহণ করে সংগঠনের দ্বিতীয় উপাদান নেতৃত্বের ব্যাপারে। এই সংগঠন রাসূলে খোদার আদর্শ অনুযায়ী নেতৃত্ব গড়ে তোলাকে অন্যতম সাংগঠনিক দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করে। এই সংগঠনের যাত্রাই শুরু হয় নেতৃত্বের মাধ্যমে। এই সংগঠনের নেতৃত্ব নায়েবে রাসূলের মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার কারণে এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আনুগত্য গ্রহণের প্রশ্ন একান্ত স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। সুতরাং ইসলামী সংগঠনের উপাদানসমূহের কথা আমরা এভাবে সাজাতে পারি।

১. কোরআন ও সুন্নাহভিত্তিক আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কর্মসূচি এবং কর্মপদ্ধতি।

২. কোরআন ও সুন্নাহর অনুসারী নেতৃত্ব।

৩. কোরআন ও সুন্নাহর বাঞ্ছিত মানের আনুগত্য।

৪. এর সাধারণ এবং বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র সমগ্র দুনিয়া, সমগ্র দুনিয়ার মানুষ। কিন্তু প্রাথমিক কর্মক্ষেত্র, যারা যে দেশে জন্মেছে, যে দেশে বসবাস করছে সেই দেশ এবং সেই দেশের জনগণ।

উল্লিখিত উপাদানগুলোর সাথে আরো দুটো উপাদান ইসলামী সংগঠনের প্রাণশক্তির ভূমিকা পালন করে আর আন্দোলনকে করে তোলে গতিশীল। তার একটা হলো পরামর্শের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা আর দ্বিতীয়টি হলো সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনার ব্যবস্থা চালু থাকা। আমরা এই পুস্তিকার শেষ অংশে নেতৃত্ব, আনুগত্য, পরামর্শ এবং সমালোচনা এই চার বিষয় পৃথক পৃথকভাবে আলোচনার চেষ্টা করব।

ইসলামী সংগঠনের প্রকৃত মডেল

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতিষ্ঠিত ইসলামই 'জামায়াতে ইসলামী' সংগঠনের প্রকৃত মডেল। একইভাবে মুহাম্মদ (সা.)-এর নেতৃত্বই ইসলামী নেতৃত্বের একমাত্র মডেল। মুহাম্মদ (সা.)-এর পরবর্তী মডেল হলো খোলাফায়ে রাশেদীন পরিচালিত ইসলামী জামায়াত। এরপরে আর কোন মডেল নেই। আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ :

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ -

তোমাদেরকে আমার ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অবশ্য অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

রাসূল (সা.) প্রতিষ্ঠিত এবং খোলাফায়ে রাশেদীন পরিচালিত ইসলামী জামায়াত, আল জামায়াত। এই মডেল অনুকরণে ও অনুসরণে গড়ে ওঠা জামায়াতের প্রকৃত লক্ষ্য হলো কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ ও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা। এইরূপ রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমেই প্রকৃত জামায়াতী জিন্দেগীর চাহিদা পূরণ হওয়া সম্ভব। আমরা বর্তমানে এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত আছি– অথচ হাদিসের আলোচনায় বুঝা যায়, ইসলামী জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইসলামী নেতৃত্বের বাইয়াত গ্রহণ ছাড়া মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কি? জাহেলিয়াতের মৃত্যু থেকে বাঁচার উপায় কি?

এই অবস্থায় আমাদের বাঁচার একমাত্র উপায় হলো, একমাত্র করণীয় কাজ হলো আল্লাহর রাসূল ও খোলাফায়ে রাশেদীনের মডেল বা সুন্নাতকে সামনে রেখে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা খেলাফত আলা মিনহাজিন্নবুয়ত প্রতিষ্ঠার জন্যে কাজ করতে একমত– এমন লোকদের সমন্বয়ে জামায়াত কায়েম করা। এই জামায়াত হবে ইসলামী রাষ্ট্রের বিকল্প। আর এই জামায়াতের নেতৃত্ব হবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের বিকল্প। এভাবে একটা অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা করে জামায়াতী জিন্দেগীর চাহিদা পূরণ করা এবং জাহেলিয়াতের মৃত্যু থেকে বাঁচা সম্ভব। কিন্তু এই জামায়াতকে প্রকৃত জামায়াত গড়ার means রূপে ব্যবহার করতে হবে। এটাকে end ভাবা ঠিক হবে না বা end ভাবলে এর মাধ্যমে যে বৃহত্তর কাজ, মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার কথা তা দেয়া সম্ভব হবে না। পরিণামে এটা একটা ফেরকায় রূপ নেয়ার আশঙ্কা থেকে যাবে।

ইসলামী সংগঠনের কার্যক্রম ও শরয়ী মর্যাদা

ইসলামী আন্দোলনের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা যে পাঁচটি পরিভাষা যেমন : ১. দাওয়াত ২. শাহাদাত ৩. কিতাল ৪. ইকামাতে দ্বীন এবং ৫. আমর বিল মা'রূফ ওয়া নেহী আনিল মুনকার– এর সামগ্রিক রূপটিই ইসলামী আন্দোলন বলে বুঝে থাকি। আর ইসলামী সংগঠন তো ইসলামী আন্দোলনের জন্যেই। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত জন শক্তিকে ইসলামী সংগঠন পরিকল্পিতভাবে উল্লিখিত কার্যক্রমগুলো আঞ্জাম দেয়ার জন্যেই ব্যবহার

করবে। অর্থাৎ ইসলামী সংগঠন দাওয়াত ইলাল্লাহ ও শাহাদাতে হকের দায়িত্ব পালনে যথার্থ ভূমিকা পালন করবে। তার জনশক্তিকে পরিকল্পিতভাবে এর যোগ্য করে গড়ে তুলবে। বিরোধী শক্তির যথার্থ মূল্যায়ন করে তার মোকাবিলার উপায় উদ্ভাবন করে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এভাবে দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে ধাপে ধাপে অগ্রসর হবে। বিজয়ী হলে তো গোটা জনমানুষের মধ্যে আমর বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকারের দায়িত্ব আঞ্জাম দেবে। কিন্তু বিজয়ী হওয়ার আগে একদিকে সংগঠনের অভ্যন্তরে এর বাস্তবায়ন হতে হবে। সেই সাথে যেখানে যতটা সম্ভব সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়ে এই দায়িত্ব পালনে প্রয়াস চালাতে হবে।

ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্বের শরয়ী মর্যাদা

এরূপ সংগঠনের শরয়ী মর্যাদা প্রসঙ্গে এতটা বলা যায় যে, জাহেলিয়াতের মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্যে ও ঈমানের দাবী পূরণের জন্যে এটাই একমাত্র অবলম্বন। এটাই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকল্প এবং রাসূল (সা.) প্রতিষ্ঠিত ও খোলাফায়ে রাশেদা পরিচালিত জামায়াতের উত্তরসূরী হিসেবে তার প্রতিনিধিত্বের মর্যাদার অধিকারী। দ্বীনের একটা ফরজ কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্যে মসজিদ কায়েম করা হয়। সেই মসজিদকে আমরা কত বড় মর্যাদা দিয়ে থাকি, আর তা আমরা দিতে বাধ্য। ইসলামী সংগঠন বা জামায়াত কায়েম হয় গোটা দ্বীন কায়েমের জন্যে, যে দ্বীন কায়েম না হলে ঐ মসজিদের নামাজও সঠিক অর্থে কায়েম হতে পারে না। এই আলোকেই আমরা বুঝে নিতে পারি, ইসলামী সংগঠনের শরয়ী মর্যাদা কি?

ইসলামী সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের বিকল্প। হাদিসে রাসূলের আলোকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য রাসূলের আনুগত্যেরই শামিল। এই সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নায়েবে রাসূলের মর্যাদার অধিকারী। অধস্তন সংগঠনের নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতিনিধি হওয়ার কারণে সর্বপর্যায়ের নেতৃত্বই পরোক্ষভাবে নায়েবে রাসূলের মর্যাদা রাখে।

ইসলামী সংগঠনের সিদ্ধান্ত সমূহের শরয়ী মর্যাদা

ইসলামী সংগঠন যেহেতু কোরআন ও সুন্নাহর আদর্শকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে এবং এই আদর্শ বাস্তবায়নের জন্যেই যাবতীয় কার্যক্রম ও পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং সে সব ক্ষেত্রেই কোরআন ও সুন্নাহর নিয়ম নীতি Spiritকে

সামনে রাখার সাধ্যমত চেষ্টা করে, সুতরাং কোন সিদ্ধান্ত কারও জানামতে কোরআন ও সুন্নাহর আদর্শের পরিপন্থী বলে মনে না হলে সেই সিদ্ধান্তকে কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশেরই মর্যাদা দিতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের মর্যাদা দিতে হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন :

مَنْ اَطَاعَنِى فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ومَنْ اَطَاعَ الاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِى -

যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে আমীরের আনুগত্য করল, সে প্রকৃতপক্ষে আমারই আনুগত্য করল। (আল হাদিস)

সুতরাং সংগঠনের কোন সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগতভাবে কারও কাছে পছন্দ না হলে বা কারও মনমত না হলেও সে সিদ্ধান্ত দ্বিধাহীনচিত্তে মেনে নিতে হবে। এই সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্য করা বা অসন্তোষ প্রকাশ করার কোন সুযোগ নেই। এইরূপ করাটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ অমান্যের শামিল হবে।

আদর্শভিত্তিক ও গণমুখী নেতৃত্বের গুরুত্ব

ইসলামী আন্দোলন সঠিক অর্থে আদর্শভিত্তিক আন্দোলন, কারণ এখানে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য একটাই– আদর্শের বিজয়, দ্বীন ইসলামের বিজয়। সেই সাথে এই আন্দোলন গণমুখীও। কারণ এর জাগতিক লক্ষ্য তো দুনিয়ার সর্বস্তরের জনমানুষের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা। সর্বস্তরের জনমানুষকে মানুষের প্রভুত্বের যাঁতাকল থেকে মুক্ত করে আল্লাহর প্রভুত্বের বিশাল ছায়াতলে আশ্রয় দেয়া। কাজেই মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী ব্যক্তি ছাড়া সবার আকর্ষণ থাকবে– আপনত্বের অনুভূতি থাকবে এই আন্দোলনের প্রতি, এটাই স্বাভাবিক। আপাততঃ এটা প্রকাশ পায় না সুবিধাভোগী, খোদাদ্রোহী শ্রেণীর প্রভাব প্রতিপত্তি ও দাপটের কারণে। কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে এই দাপটের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। আল্লাহর সাহায্যে যখন বিজয়ের মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে তখন বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত মানুষ সমর্থন দিতে থাকে এই আন্দোলনকে।

এই আন্দেলনের মাধ্যমে যে সংগঠন তা হবে প্রধানতঃ আদর্শভিত্তিক। নেতৃত্ব সৃষ্টি, কর্মী সংগ্রহ ও গঠন, সংগঠনের বিস্তৃতি ও দৃঢ়করণ, গণসংযোগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতি নির্ধারণ যাবতীয় ক্ষেত্রে আদর্শই হবে এর Guiding force। এই

ব্যাপারে সামান্যতম আপোষের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু এভাবে আদর্শের প্রাধান্যের কারণে আন্দোলন ও সংগঠন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না এবং গণমুখী চরিত্র হারাবে না। কারণ ইসলামী আদর্শ স্বয়ং একটি গণমুখী আদর্শ। ইসলামী আন্দোলনের বক্তব্য মজলুম ও ভুক্তভোগী জনমানুষের সুপ্ত ও অব্যক্ত ব্যথা বেদনারই অভিব্যক্তি। দা'য়ী (আহ্বানকারী) তার বক্তব্য সার্থকভাবে আপোষহীনভাবে উপস্থাপন করতে পারলে, শাহাদাতে হকের বাস্তব নমুনা তুলে ধরতে সক্ষম হলে, জনমানুষের মনের সুপ্ত ও অব্যক্ত কামনা-বাসনা, ব্যথা-বেদনা একদিন প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের রূপ নিয়ে দা'য়ীর পাশে দাঁড়াবে।

এভাবে ইসলামী আন্দোলনের সর্বস্তরের কর্মীবাহিনী তাদের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও আদর্শের দাবী অনুযায়ী জনমানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কমসংখ্যক লোক নিয়েও আন্দোলনে গণমুখী ধারা সৃষ্টি করতে পারে। একটা সংগঠনের গণমুখী হওয়ার জন্যে পাইকারীভাবে সর্বস্তরের মানুষের সংগঠনভুক্ত হওয়া জরুরী নয়। বরং জরুরী হলো সর্বস্তরের মানুষকে সাথে নিয়ে চলতে পারে, সর্বস্তরের মানুষের কাছে আন্দোলন ও সংগঠনের বক্তব্য নিয়ে যেতে পারে, সার্থক প্রতিনিধিত্ব করতে পারে কথা ও কাজের মাধ্যমে, এমন মুষ্টিমেয় লোক। কোরআন বলে كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ। কত ছোট ছোট দল বিরাট বিরাট দলকে আল্লাহর সাহায্যে পরাভূত করেছে। (আল বাকারা : ২৪৯)

এই ছোট ছোট দল আকারে, সংখ্যা-শক্তির বিচারে ক্ষুদ্র হলেও সমাজের সজাগ-সক্রিয় জনশক্তি হওয়ার কারণে, সেই সাথে জনমানুষের উপর নৈতিক ও আদর্শিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা হওয়ার কারণে সর্বস্তরের জনমানুষকে সাথে নিয়ে চলা বা সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তির উপর বিজয় লাভ করা সম্ভব হয়েছে। রাসূল (সা.)-এর সংগঠনের সূচনালগ্নে মাত্র চারজন সাথী নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন, সংখ্যার বিচারে এরা চারজন। কিন্তু গুণগত বিচারে সেই সময়ের মক্কার জনজীবনের সাথে এদের ছিল নাড়ির সম্পর্ক। চারজনই গোটা জনপদের সর্বশ্রেণীর জনমানুষের প্রতিনিধিস্থানীয়। হযরত আবুবকর (রা.) সার্বিক বিচারে সেই সমাজের বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল তথা সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। হযরত খাদীজা (রা.) সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী সমাজের সবার প্রতিনিধিত্ব করার মত যোগ্যতা রাখতেন। বরং তাঁর সুনাম খ্যাতি ও

প্রভাব-প্রতিপত্তি নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে ছিল উল্লেখযোগ্য। হযরত আলী (রা.) একজন কিশোর, শুধু ব্যক্তি মাত্র নয়। সমাজের যুবক ও কিশোরদের প্রতিনিধিত্ব করার ও তাদেরকে সাথে নিয়ে চলার সার্বিক যোগ্যতা তার ছিল। এভাবে হযরত যায়েদ নিছক একজন ব্যক্তি নন। একজন ক্রীতদাস মানে সেই সময়ের মজলুম ও মেহনতী মানুষের প্রতিনিধিস্থানীয়। মাত্র এই পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট কাফেলাটিকেও [যার নেতৃত্বে রাসূলে পাক (সা.)] আমরা সার্বিক বিচারে আদর্শের প্রশ্নে আপোষহীন একটি গণমুখী সংগঠন বলতে পারি। রাসূলে পাক (সা.)-এর আন্দোলনের প্রাথমিক স্তরের এই সাংগঠনিক রূপটাই ইসলামী সংগঠনের মডেল। এই ভাবেই একটা আন্দোলন পরিপূর্ণ আদর্শবাদী চরিত্র নিয়ে চলার সাথে সাথে গণমুখী ভূমিকাও পালন করতে পারে।

নেতৃত্বের গুরুত্ব

যে কোন আন্দোলন ও সংগঠনের নেতৃত্ব প্রধান Factor হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে। ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনেরও নেতৃত্বের ভূমিকা এই পর্যায়েরই। বরং আরও অনেক বেশী গুরুত্বের দাবীদার। কারণ ইসলামী আদর্শ বা জীবন ব্যবস্থাটা মূলত নেতাকেন্দ্রিক। এর যাবতীয় কার্যক্রমে নেতৃত্বের ভূমিকা প্রধান। আল্লাহর ও রাসূলের আনুগত্যের যে কাঠামো আল কোরআন ঘোষণা করেছে তাতেও নেতৃত্বকে প্রধান ভূমিকায় রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে :

أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ -

আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং সেই সব লোকেরও যারা তোমাদের মধ্যে শাসনের দায়িত্বসম্পন্ন। (আন নিসা : ৫৯)

লক্ষণীয় আল্লাহর এতায়াত ও রাসূলের এতায়াত আমরা কি সরাসরি সব ক্ষেত্রে করতে পারি? আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সর্বত্রই আল্লাহ ও রাসূলের এতায়াত উলিল আমরের এতায়াতের মাধ্যমেই করা সম্ভব। এইজন্যেই রাসূল (সা.) বলেছেন, যারা আমার আনুগত্য করে, তারা আল্লাহর আনুগত্য করে। আর যারা আমীরের আনুগত্য করে, তারা আমার আনুগত্য করে। আনুগত্যের অধ্যায়ে বিষয়টি আরও বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

নেতৃত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন :

اِنَّمَا الاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهٖ وَيُتَّقٰى بِهٖ.

ইমাম বা নেতা ঢালস্বরূপ, যাকে সামনে রেখে লড়াই করা যায় এবং আত্মরক্ষা করা যায়। (আল হাদিস)

মাত্র দু'জন কোথাও ভ্রমণে বের হলেও একজনকে নেতা মানার নির্দেশ থেকে আমরা বুঝতে পারি, মুসলমান নেতাবিহীন জীবন যাপন করতেই পারে না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকায়েদের কিতাবসমূহে নেতৃত্ব বা ইমামতকে ইসলামের মৌলিক বিষয় হিসেবেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ঐ সব কিতাবে ইমাম নিয়োগ (نصب الامام) ও ইমামের মর্যাদা বিষয়ে একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় স্থান পেয়েছে। এখানে দলিলের ভিত্তিতে ইমাম নিয়োগকে উম্মতের জন্যে ওয়াজিব বলা হয়েছে– অবশ্য এই ওয়াজিব ও ফরযের মধ্যে মানগত ও গুণগত কোন পার্থক্য নেই। প্রথম দলিল হাদিসে রাসূল থেকে বলা হয়েছে :

مَنْ مَاتَ وَلَيْس فِىْ عُنُقِهٖ بَيْعَةٌ مَات مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً–

যে ব্যক্তি ইমামের বাইয়াত গ্রহণ ব্যতীত মারা যায়, তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম)

দ্বিতীয় দলিল হিসেবে পেশ করা হয় সাহাবায়ে কেরামগণের (রা.) ইজমা। রাসূলে পাক (সা.) ইন্তেকালের পর তাঁর কাফন, জানাযা ও দাফনের কাজ সমাধা করার আগেই উম্মতে মুসলিমার জন্যে ইমাম নিযুক্ত করাকে তারা সর্বসম্মতভাবে জরুরী মনে করেছেন।

মানব প্রকৃতির এটা একটা স্বাভাবিক প্রবণতা যে, সে তার চেয়ে বড়, উন্নত বা উত্তম কারও অনুসরণ করতে চায়। ইসলাম মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা আদর্শ, তাই মানবজাতিকে ইসলামের পথে চলার জন্যে অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য কিছু ব্যক্তি সৃষ্টিকেই ইসলাম প্রাধান্য দিয়েছে :

لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ.

যেন রাসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষী হয়, আর তোমরা সাক্ষী হও সব লোকের জন্য। (আল হাজ্জ : ৭৮)

এই বক্তব্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এটাই।

ইসলামী নেতৃত্বের সংজ্ঞা

ইসলামী নেতৃত্ব তিনটি শব্দের মর্মার্থের ধারক-বাহক। (১) খলীফা (২) ইমাম (৩) আমীর।

এক : খলিফা অর্থ প্রতিনিধি। মানুষ মাত্রই আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা। এরপরও নেতাকে খলিফা বলা হয় কেন? অন্য কথায় খোলাফায়ে রাশেদীন কোন অর্থে খলীফা ছিলেন। একটু চিন্তা করলে এবং তাদের বাস্তব কাজের সাথে মিলিয়ে একে বিচার করলে দেখা যায় তারা তিন অর্থে খলিফা ছিলেন। (১) খলিফাতুল্লাহ বা আল্লাহর খলিফা হিসেবেই আল্লাহর দীন জারি করা ও আল্লাহর হুকুম আহকাম জারি করার দায়িত্ব পালন করেছেন। (২) খলিফাতুর রাসূল, রাসূল (সা.)-এর অবর্তমানে তাঁরই কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। মুসলমানদের মূল নেতা রাসূল (সা.), তারা মুসলমানদের পরিচালনা করেছেন কেবলমাত্র তাঁরই প্রতিনিধি হিসেবে। (৩) খলিফাতুল মুসলেমীন বা মুসলমানদের প্রতিনিধি। আমরা একটু আগেই উল্লেখ করেছি মানুষ মাত্রই আল্লাহর খলিফা। কিন্তু মানুষের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনে, ইসলাম কবুল করে তারাই এই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করে। মুসলমানদের খলিফা বা প্রতিনিধিত্বের কাজ এই ক্ষেত্রে ইজতেমায়ীভাবে খিলাফতের দায়িত্ব পালনের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা, তদারক করা ও নিয়ন্ত্রণ করা। খোলাফায়ে রাশেদীন এই তিন অর্থেই খলিফা ছিলেন। আজকেও ইসলামী নেতৃত্বকে উল্লিখিত তিন অর্থেই খলীফার ভূমিকা পালন করতে হবে।

দুই : যে সামনে চলে তাকেই ইমাম বলা হয়। নামাজের ইমামতি যিনি করেন তিনি সামনে থাকেন। শুধু সামনে থাকেন তাই নয়, তিনি তার পেছনের লোকদের যে নির্দেশ দেন, সে নির্দেশ তিনি নিজে সবার আগে পালন করেন। রুকুর নির্দেশ দিয়ে তিনি বসে থাকেন বা দাঁড়িয়ে থাকেন, অন্যরা রুকু করে বা তিনি সেজদার নির্দেশ দিয়ে নিজে তামাশা দেখেন, অন্যরা নির্দেশ পালন করেন এমনটি কখনো হয় না। বরং ঐসব নির্দেশের উপর তিনি আগে আমল করেন।

তিনি রুকুতে যান অন্যরা তাকে অনুসরণ করেন। তিনি সেজদায় যান তাকে দেখে অন্যরা সেজদা করেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) ত্যাগ ও কোরবানীর নজীরবিহীন উদাহরণ স্থাপনে সক্ষম হওয়ার পর তাঁকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. আমি তোমাকে মানবজাতির জন্যে ইমাম বানাতে চাই। এখানে ইমাম অর্থ যেমন নেতা, তেমনি অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য ব্যক্তিত্বও। ত্যাগ, কোরবানীর ক্ষেত্রে, ঈমানের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে এবং আল্লাহর নির্দেশ মাথা পেতে নেয়ার ক্ষেত্রে তিনি সারা দুনিয়ার মানুষের ইমাম বা অনুসরণীয়।

হাদিসে রাসূলের শিক্ষা অনুযায়ী নেতৃত্ব কামনা করার বা চাওয়ার এবং এই জন্যে চেষ্টা করার কোন সুযোগ নেই। সুতরাং ইমাম অর্থ যদি শুধু নেতা হয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালার শেখানো দোয়া وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا আমাদেরকে (আমার পরিবারকে) মুত্তাকীদের ইমাম বানাও– এর সাথে হাদিসে রাসূলের ঐ কথার Contradiction হয়। কিন্তু যদি এখানে ইমাম অর্থ আদর্শ বা অনুসরণযোগ্য বা অগ্রণী বা অগ্রগামী অর্থ নেয়া হয় তাহলে আর কোন অসুবিধা থাকে না। প্রত্যেক মুসলমান এই কামনা করতে পারে, চেষ্টা সাধনাও করতে পারে যে তাকে অন্যান্যদের জন্যে অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য আদর্শস্থানীয় হতে হবে এবং নমুনা পেশ করতে হবে। ইসলামী নেতৃত্বের মধ্যে ইমামতের এই মর্ম ও তাৎপর্যের বাস্তব প্রতিফলন থাকতে হবে।

তিন : আমীর আদেশদাতাকে বলা হয়। আমর যার পক্ষ থেকে আসে সে-ই আমীর বা উলিল আমর। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে আসল আদেশদাতা, হুকুমকর্তা একমাত্র আল্লাহ। إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّٰهِ হুকুম দেওয়ার অধিকার তো একমাত্র আল্লাহর।

أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. তোমরা ভাল করে জেনে নাও, গোটা সৃষ্টিও আল্লাহর এবং সৃষ্টির সর্বত্র হুকুমও চলবে একমাত্র তাঁরই। তাহলে আমীরের কাজটা এখানে কি? আমীরের কাজ হবে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন। আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধের ভিত্তিতে মুসলিম উম্মতকে পরিচালনা করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ইসলামী নেতৃত্ব রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যে চারটি কাজ করবে। যেমন ঃ (১) নামাজ কায়েম করবে (২) জাকাত আদায় করবে (৩)

সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং (৪) অসৎ কাজে বাধা দেবে। এই চারটি কাজের সবটাই আল্লাহর আদেশ। এখানে আমীরের দায়িত্ব শুধু আল্লাহর এই আদেশ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্যে নামাজ বাধ্যতামূলক করবে। বাধ্যতামূলক জাকাত আদায় করবে। কিন্তু এটা তার নিজের নির্দেশ নয়, আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ মাত্র। যেখানে কোরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট আদেশ বা নিষেধ পাওয়া যায় না, এমন ক্ষেত্রে নির্দেশ দেওয়ার ব্যাপারে তাকে নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করতে হবে। কোরআন সুন্নাহর মূলনীতি ও Spirit এর সাথে পরিপূর্ণ সঙ্গতি রেখেই যেন নির্দেশ দিতে পারেন। ব্যক্তিগত খাহেশপ্রসূত ইজতেহাদের ভিত্তিতে কোন আদেশ নিষেধ জারী করার অধিকার ও এখতিয়ার তার নেই।

ইসলামী নেতৃত্বের প্রক্রিয়া

খোলাফায়ে রাশেদীনের নেতৃত্ব লাভের ব্যাপারটা গভীরভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করলে দেখা যাবে, রাসূল (সা.)-এর সাথীদের মধ্যে যারা তাঁর অনুসরণে সবচেয়ে অগ্রণী ছিলেন ঈমানের দৃষ্টিতে, তাকওয়ার দৃষ্টিতে, ত্যাগ-কোরবানীর দৃষ্টিতে, মাঠে ময়দানে সামগ্রিক কার্যক্রমের দৃষ্টিতে– পর্যায়ক্রমে তাদের হাতেই মুসলিম জাহানের নেতৃত্ব এসেছে। আর নেতৃত্ব এসেছে মুসলিম উম্মাহর স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের ভিত্তিতে। কারও পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্যে কোন অভিযান চালাতে হয়নি। কাজেই আমরা এখানে নেতৃত্ব নির্বাচনের দুটো মানদণ্ড পাচ্ছি। একটা আদর্শের মানে বেশী অগ্রসর। দ্বিতীয়ত: এই অগ্রণী ভূমিকার স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি, এই প্রক্রিয়াই ইসলামী সংগঠনে অনুসরণীয়। এখানে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন সংগঠনের জনশক্তির সেই অংশের প্রতি যারা নিজেদেরকে সংগঠনের কাছে পরিপূর্ণরূপে সঁপে দিয়েছে এবং সংগঠনও যাদের প্রতি পূর্ণ আস্থা পোষণ করেছে।

খেলাফত, ইমামত ও ইমারতের অর্থ ও তাৎপর্য বহনকারী নেতৃত্বই যেহেতু ইসলামী সংগঠনের কাম্য, সুতরাং সংগঠনের নেতৃত্ব হবে আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। তাকে সংগঠনের স্বীকৃত ক্যাডারের আস্থাভাজন হতে হবে এবং ক্যাডারদের স্বতঃস্ফূর্ত পছন্দের ভিত্তিতে নির্বাচিত হতে হবে। ইসলামী সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই যেহেতু আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিত্ব, এই কারণে অধস্তন

সংগঠনের নেতৃত্ব হবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতিনিধি। ইসলামে পরামর্শভিত্তিক কাজের গুরুত্ব আছে বিধায় অধস্তন সংগঠন ক্যাডারভুক্ত লোকদের আস্থা যাচাইয়ের জন্যে তাদের পরামর্শ অবশ্য অবশ্যই নিতে হয়। কিন্তু মূলত এসব নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতিনিধি হিসেবেই দায়িত্ব পালন করবে– এটাই রাসূলে করীম (সা.) ও খোলফায়ে রাশেদীনের যামানার ঐতিহ্য।

ক্যাডারদের প্রতিনিধিস্থানীয় এবং আহলে রায় লোকদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা পরামর্শ সভা বা মজলিসে শুরা নেতৃত্বকে সংগঠন পরিচালনায়, নীতি নির্ধারণে, কোরআন সুন্নাহর Spirit অনুসরণে সহযোগিতা দান করবে।

নীতিগতভাবে ইসলামের যৌথ নেতৃত্বের কোন ধারণা নেই। কিন্তু ইসলামের শূরায়ী নেজাম অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে– অনৈসলামিক পরিবেশে একক নেতৃত্বের যেসব খারাপ দিক যথা– স্বেচ্ছাচারিতা, একনায়কত্বের প্রবণতা ইত্যাদির প্রকাশ ঘটে থাকে, এখানে সেগুলোর কোন অবকাশ থাকে না। ইসলামী নেতৃত্বের পাশে শূরায়ী নেজাম থাকার ফলে নেতৃত্বের এই System আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞানুযায়ী প্রেসিডেন্সিয়াল ও পার্লামেন্টারী System এর খারাপ দিকগুলো থেকে মুক্ত। অথচ উভয় System এর ভাল দিকগুলো ধারণ করে।

আমাদের মূল নেতা মুহাম্মদ (সা.) তাঁর অবর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্বই হোক আর ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্বই হোক তাকে রাসূলের প্রতিনিধিস্থানীয় হতে হবে। শেষ নবীর পর তাঁর উম্মতের নেতৃত্বের জন্যে কোন বিশেষ বংশের, গোত্রের বা শ্রেণীর জন্যে কোন স্থান নির্ধারিত নেই। সুতরাং উম্মতের নেতৃত্ব উম্মতের মধ্য থেকেই আসতে হবে এবং সেটা আসবে নবীর উসওয়ায়ে হাসানার অনুসরণের মানদণ্ডেই। নবী (সা.) এর উসওয়ায়ে হাসানা নেতা কর্মী সবার জন্যেই। সুতরাং সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে এই উসওয়ায়ে হাসানা অনুসরণে যত অগ্রসর হবে, যত বেশী তৎপর হবে, নেতৃত্বের মান ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কারণ এই নেতৃত্ব আসবে কর্মীদের মধ্য থেকে।

আমরা ইসলামী নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যময় গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল কোরআন হযরত ইব্রাহীম (আ.), মূসা (আ.) ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রসঙ্গে যেসব কথা উল্লেখ করেছে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াস পাব।

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা অনেক অনেক কথাই উল্লেখ করেছেন, যার সারমর্ম দাঁড়ায়, তিনি ছিলেন ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক, আল্লাহর

প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। ঈমানের প্রতিটি পরীক্ষায় অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি। এর পরেই আল্লাহর ঘোষণা এসেছে :

اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا.

হে ইব্রাহীম (আ.)! আমি তোমাকে বিশ্বের সমস্ত মানুষের নেতা বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সংগ্রামী জীবন থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণের তাকিদ দিয়েছেন। তার জীবন থেকে আমরা নিম্নলিখিত শিক্ষাগুলো পেয়ে থাকি।

১. তাওহীদের প্রশ্নে আপোষহীন, প্রয়োজনে সর্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত। মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন ছাড়তে প্রস্তুত। তাঁর ঘোষণা, হে আমার কওম! তোমরা যেসব শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত আমি তা থেকে নিজেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করছি। আমি তো সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে ধাবিত হচ্ছি সেই মহান সত্তার প্রতি যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা। আর আমি মুশরীকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

২. আল্লাহর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ, আল্লাহর যে কোন হুকুমের কাছে বিনা দ্বিধায় আত্মসমর্পনকারী। তখন তাকে বলা হয় اَسْلِمْ আত্মসমর্পন কর। তিনি বললেন :

اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

আমি রাব্বুল আলামীনের কাছে আত্মসমর্পন করলাম।

৩. ইমানের প্রতিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আল্লাহ তাঁকে মানুষের নেতা হিসেবে ঘোষণা দেয়ার আগে তাকে সনদ দিলেন এই ভাষায় :

وَاِذَا ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ.

আর ইব্রাহীম (আ.)কে অনেকগুলো ব্যাপারে পরীক্ষা নেয়া হলো। তিনি সে সবগুলো পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হলেন। (আল বাকারা : ১২৪)

নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়া তিনি পছন্দ করলেন। কিন্তু নমরুদের কাছে মাথা নত করলেন না, তৌহীদের আদর্শ থেকে বিন্দু বিসর্গ এদিক ওদিক হলেন না, বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী ও কোলের শিশু সন্তানকে জন-প্রাণীহীন একস্থানে নির্বাসন দেয়ার নির্দেশ অবলীলাক্রমে পালন করলেন। অবশেষে ঐ পুত্র সন্তান

একটু বড় হওয়ার পর, তাঁর বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করতে পারে, এমন পর্যায়ে আসার পর তাকে নিজ হাতে কোরবানী করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাঁর পরিবারকেই একটা মহা পরীক্ষায় ফেললেন। তাঁরা সবাই মিলে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ার জন্যে ইসলামী নেতৃত্বকে উল্লিখিত তিনটি গুণের অধিকারী অবশ্যই হতে হবে। মনে রাখতে হবে, ঈমানের অগ্নি পরীক্ষায় ব্যর্থ ব্যক্তিরা কখনই এত বড় কাজের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হতে পারে না।

হযরত মূসা (আ.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দুটো বিশেষ গুণের উল্লেখ হয়েছে, একটা (قوى) অর্থাৎ শক্তিশালী, অপরটি (امين) অর্থাৎ বিশ্বস্ত এবং আমানতদার। আর এই শক্তিশালী ও আমানতদার ব্যক্তিটি নবুয়তের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ পেয়ে, ফেরাউনের দরবারে দাওয়াত নিয়ে যাবার নির্দেশ পেয়েই আল্লাহর কাছে বিশেষ কয়টি বিষয়ের জন্যে দোয়া করলেন, তৌফিক চাইলেন, সেই বিষয়গুলো সর্বকালের সর্বযুগের ইসলামী নেতৃত্বের জন্যেই পথ-পাথেয়।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ. وَيَسِّرْلِيْٓ أَمْرِي - وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ - يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ - وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ - هَارُوْنَ اَخِي - اشْدُدْبِهٖٓ اَزْرِيْ- وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ - كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا - وَنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا. اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا -

মূসা (আ.) নিবেদন করল হে খোদা! আমার বুক খুলে দাও, আমার কাজকে আমার জন্যে সহজ করে দাও এবং আমার মুখের গিরা ঢিলা করে দাও, যেন লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। আর আমার জন্যে আমার নিজের পরিবারের মধ্য হতে একজন সহকর্মী নির্দিষ্ট করে দাও। হারুন যে আমার ভাই, তাঁর সাহায্যে আমার হাত মজবুত কর এবং তাঁকে আমার কাজে শরীক বানিয়ে দাও, যেন আমরা খুব বেশী করে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি, তোমার কথা খুব বেশী মাত্রায় চর্চা, আলোচনা ও স্মরণ করি। তুমি তো সব সময়ই আমাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিবান থেকেছ। (ত্ব-হা ২৫-৩৫)

হযরত মূসা (আ.)-এর এই দোয়া আল্লাহ তায়ালা সূরায়ে ত্ব-হার মধ্যে উল্লেখ করেছেন। উক্ত দোয়ায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আমরা পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

এক. শরহে ছদর। যার শাব্দিক অর্থ বক্ষ সম্প্রসারণ। আর ভাব অর্থ হলো নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা। নিজের আদর্শ ও অর্পিত দায়িত্ব পালনে মনে কোন প্রকারের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, কোন রকমের সংকীর্ণতা না থাকা। রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী, চরম স্বৈরাচারী এক শাসক। তার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সেই সময় সর্বজনবিদিত। তার ধনবল, জনবল, ক্ষমতা, প্রতিপত্তির মোকাবিলায় হযরত মূসা (আ.)-এর ন্যায় একজন সহায় সম্বলহীন ব্যক্তিকে তার দরবারে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এই নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্যে মূসা (আ.)-এর সামনে দুটো বিষয় সন্দেহাতীতভাবে পরিষ্কার হওয়া দরকার ছিল।

১. নিজে হকের উপর আছেন– এই ব্যাপারে কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা অস্পষ্টতা না থাকা এবং এই হক প্রতিষ্ঠা কিভাবে করতে হবে এই সম্পর্কে স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট ধারণা থাকা।

২. ফেরাউনী শক্তি যে বাতিল শক্তি, আপাতদৃষ্টিতে সে যতই শক্তিধর হোক না কেন, পরিণামে তাকে ধ্বংস হতেই হবে এই সম্পর্কেও মনে সুদৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হওয়া।

দুই. তাইছিরে আমর বা কাজকে যথাসাধ্য সহজভাবে আঞ্জাম দিতে প্রয়াস পাওয়া। দা'য়ী বা ইসলামী নেতৃত্ব যে কোন সময় যে কোন প্রকারের ঝুঁকি নেয়ার জন্যে প্রস্তুত থাকবে। ঝুঁকি বা বিপদ-আপদকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করবে। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে ঝুঁকি, পরীক্ষা বা বিপদ-মুছিবত কামনা করবে না। বরং নিজের দিক থেকে যথাসাধ্য সহজভাবে, সহজ উপায়ে কাজ সমাধানের প্রয়াস চালাবে এবং সেই প্রয়াসে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে। সূরা বাকারায় আল্লাহ এর সম অর্থবোধক দোয়া শিখিয়েছেন :

رَبَّنَا وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَاتُحَمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهٖ ج وَاعْفُ عَنَّا وقفه
وَاغْفِرْلَنَا وقفه وَارْحَمْنَا وقفه اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى

الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

হে আমাদের রব! আমাদের উপর এমন বোঝা চাপিও না যেরূপ বোঝা তুমি পূর্ববর্তী লোকদের উপর চাপিয়েছ। হে আমাদের রব! আমাদের উপর এমন বোঝা চাপিও না যা বহনের ক্ষমতা আমাদের নেই। তুমি মাফ কর, রহম কর। তুমিই আমাদের মাওলা, অতএব কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে তুমি আমাদেরকে বিজয় দান কর। (আল বাকারা : ২৮৬)

হাদিসে রাসূলে বলা হয়েছে :

لاَ تُشَدِّدُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدِ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ.

তোমরা নিজেদের উপর কৃত্রিমভাবে কোন কড়াকড়ি আরোপ করো না, তাহলে আল্লাহ তোমাদের উপর কড়াকড়ি আরোপ করে বসবেন।

يَسِّرُوْا وَلاَتُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلاَتُنَفِّرُوْا.

দ্বীনের কাজকে মানুষের জন্যে যথাসাধ্য সহজ করে পেশ কর। কঠিন করো না। লোকদের সুসংবাদ শুনাও। তাদেরকে বীতশ্রদ্ধ করে ফেলো না। (জামউল ফাওয়াএদ)

তিন. হল্লে আকদ। ভাষা জনগণের বুঝার উপযোগী হতে হবে। অবশ্যই দা'য়ী তার আদর্শের কথা বলবেন। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তিনি নীতি বদলাবেন না, কিছু রেখে ঢেকেও বলবেন না। কিন্তু বলবেন এমনভাবে যাতে করে যাদেরকে বলা হয় তারা সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হয়। নেতাকে জনগণের উদ্দেশ্যেও কথা বলতে হয়, সেক্ষেত্রে কথা জনগণের বুঝবার উপযোগী হয়ে আসতে হবে। কর্মীদের পরিচালনা করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নমুখী হেদায়াত দিতে হয় তাও তাদের মত হয়ে আসতে হবে।

চার. বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও অন্তরঙ্গ সাথী-সহকর্মী কামনা। এভাবে নিজের দায়িত্ব মজবুত ও সুদৃঢ়ভাবে আঞ্জাম দেয়ার মত উপায় উপকরণ বের করা এবং তাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা। অনুরূপ বিশ্বস্ত ও নির্ভযোগ্য সাথী হিসেবে হযরত ঈসা (আ.) পেয়েছিলেন হাওয়ারীদেরকে। শেষ নবী (সা.) পেয়েছিলেন হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলীর ন্যায় মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে

থেকে তাদের অসংখ্য নিবেদিত প্রাণ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)দেরকে।

পাঁচ. এই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সাথী-সহকর্মী কামনা এবং এই জন্যে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ, নিছক নিজের নেতৃত্ব মজবুত করা বা নিজের প্রতি কিছু লোককে বশংবদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য হবে না, বরং নেতা ও সহকর্মী সবার লক্ষ্য হবে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বেশী বেশী করে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ, জিকির করা যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের যাবতীয় কার্যক্রমের আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হয়।

শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই আমাদের জন্যে প্রত্যক্ষ অনুসরণীয় আদর্শ। তাঁর এই বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গেলে তো গোটা কোরআনকেই আলোচনা করতে হয়। কারণ গোটা কোরআনই ছিল তাঁর আদর্শ। তিনি হলেন বাস্তব ও জীবন্ত কোরআন, আন্দোলনের মূল নেতা হিসেবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর যে গুণাবলী বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, তার কিছু অংশ আমরা আলোচনা করবো। সূরায়ে আল আহযাবে আল্লাহ বলেন :

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا. وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا - وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلاً كَبِيْرًا - وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَدَعْ اَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلاً -

হে নবী! আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীস্বরূপ, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে এবং খোদার অনুমতিক্রমে তাঁর প্রতি আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে। (তোমার প্রতি) ঈমান গ্রহণকারী লোকদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্যে খোদার তরফ হতে বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে এবং কাফের ও মুনাফিকদের সম্মুখে আদৌ দমে যেও না, তাদের নিপীড়নকে মাত্রই পরোয়া করো না, খোদার উপর ভরসা কর, আল্লাহই যথেষ্ট যে, মানুষ সমস্ত ব্যাপার তাঁরই উপর সোপর্দ করে দিক। (আল আহযাব : ৪৫-৪৮)

উল্লিখিত আয়াত ক'টিতে মানুষের নেতা হিসেবে সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ নেতার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে, তা থেকে নিম্নোক্ত জিনিসগুলো আমরা অনুধাবন করতে পারি।

এক. তিনি শাহেদ। সত্যের সাক্ষ্যদাতা। বাস্তবে নমুনা পেশ করে সাথী-সঙ্গীদের দ্বীনের পথে পরিচালনা করেন। দ্বীনের তালিম দেন। কেবল মুখের নছিহত বা নির্দেশের মাধ্যমে নয়।

দুই. তিনি মুবাশশির। শুভ সংবাদদাতা। আল্লাহর দ্বীন কবুল করে, অনুসরণ করে মানুষ দুনিয়ায় ও আখেরাতে কি কি কল্যাণ পাবে এই ব্যাপারে মানুষকে অবহিত করা তার দায়িত্ব। এই দায়িত্ব তিনি কাঠখোট্টাভাবে পালন না করে দরদপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেন। ফলে মানুষ, তাঁর সাথী-সঙ্গীগণ জযবা, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা অনুভব করে।

তিন. তিনি নাজির। আল্লাহর দ্বীন বর্জন ও অমান্য করার পরিণামে দুনিয়ায় কি কি অসুবিধা আছে, আখেরাতে কি কি কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে, এই ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক বা সাবধান করা তাঁর অন্যতম কাজ। এভাবে শুভ সংবাদ দান ও সতর্কীকরণের মতো দুটো কাজ একত্রে করার ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠে অদ্ভুত এবং নজীরবিহীন ভারসাম্যপূর্ণ চরিত্র। মানুষের সমাজ পরিচালনার জন্যে যা একান্ত অপরিহার্য।

চার. তিনি দা'য়ী ইলাল্লাহ। তাঁর আন্দোলন-সংগঠন, তাঁর পরিচালনা -পরিবেশনা সব কিছুর সারকথা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা। সূরায়ে ইউসুফে তো এটাকেই একমাত্র কাজ বা প্রধানতম কাজ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে :

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ.

বল, এটাই আমার পথ যে, আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই।

উল্লিখিত চারটি বৈশিষ্ট্যময় গুণের বর্ণনা আসছে– নবীর পরিচয়, তাঁর কাজের পরিচয় হিসেবেই। দ্বিতীয় গুণের প্রয়োগের জন্যে নির্দেশ আসছে– মুমিনদেরকে এই মর্মে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় ধরনের অনুগ্রহ অপেক্ষা করছে। আর প্রথমগুলোর প্রয়োগ হিসেবে নির্দেশ আসছে– কাফের এবং মুনাফিকদের কাছে কখনও নতি স্বীকার করবে না, তাদের জুলুম নির্যাতনের কোনই পরোয়া করবে না। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর। এভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করাই যথেষ্ট।

সূরায়ে আত-তাওবায় শেষ দু'টি আয়াতে বলা হয়েছে :

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ . فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لَآاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

দেখ, তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে একজন রাসূল এসেছেন, তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া তাঁর জন্যে খুবই কষ্টদায়ক। তোমাদের কল্যাণের ব্যাপারে তিনি খুবই আগ্রহী (তোমাদের কল্যাণ তাঁর কাছে খুবই লোভনীয়)। ঈমানদারদের জন্যে তিনি বড়ই সংবেদনশীল ও দয়ালু। এখন যদি এরা আপনার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে হে নবী, আপনি তাদের বলে দিন, আল্লাহই আমার জন্যে যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর উপরই আমি ভরসা করছি। তিনি তো আরশে আজিমের মালিক। (আত তাওবা : ১২৮-১২৯)

সূরায়ে আলে ইমরানে আল্লাহর রাসূলকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ج وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ص فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الاَمْرِ ج فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ.

হে নবী! এটা আল্লাহ তায়ালার বড় মেহেরবানী যে, আপনি তাদের জন্যে খুবই নরম দিলের পরিচয় দিতে পারছেন। এই না হয়ে যদি আপনি কড়া মেজাজের মানুষ হতেন, আর আপনার দিল পাষাণ হতো, তাহলে এরা সব আপনার নিকট থেকে দূরে সরে যেত। তাদের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দিন, আল্লাহর কাছেও তাদের জন্যে ক্ষমা চেয়ে দোয়া করুন এবং দ্বীনের কাজে তাদের সাথেও পরামর্শ করুন। যদি কোন ব্যাপারে আপনি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হন, তাহলে সে ব্যাপারে আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ তো সেই সব লোকদেরকেই পছন্দ করেন, যারা তাঁরই উপর ভরসা রাখে। তাঁরই উপর ভরসা করে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা ও সমাধা করে। (আলে ইমরান : ১৫৯)

সূরা তাওবার শেষ আয়াতটির আলোকে রাসূলের পরিচয়

(১) মানুষের দুঃখ-কষ্ট তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন। শুধু তাই নয়, কিসে কষ্ট লাঘব হতে পারে, কষ্ট দূর হতে পারে, সেই চিন্তা নিয়ে তিনি পেরেশান ও ব্যস্ত থাকেন, (২) কিসে মানুষের কল্যাণ হতে পারে, কিসে মানুষের জীবন ইহকাল ও পরকালে সুখ-শান্তি ও কল্যাণকর হতে পারে সদা সেই চিন্তা ও ভাবনা পোষণ করেন। মানুষের কল্যাণই তাঁর বড় আগ্রহের ব্যাপার, কারণ তিনি রহমাতুল্লিল আলামীন, (৩) মুমিনদের প্রতি বিশেষভাবে তিনি দয়াপরবশ এবং দরদী মনের অধিকারী, (৪) এভাবে দরদী মনের মানুষ সাধারণতঃ দুর্বলচেতা হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহর রাসূল এবং রাসূলের মাধ্যমে তাঁর উম্মত ও উম্মতের মধ্য থেকে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা একটা বেপরোয়া মনোভাবের সৃষ্টি করে দেয়। ফলে এই দরদী মনের লোকেরাও প্রয়োজনে গোটা দুনিয়ার সমস্ত শক্তির বিরোধিতাকেও পরোয়া করে না। সারা দুনিয়া একদিকে হলেও তাদের মনের দৃঢ়তায় কোন ভাটা পড়ে না।

সূরা আলে ইমরানের বর্ণনাতেও এর কাছাকাছি বক্তব্যই এসেছে। ১) দিল অত্যন্ত নরম ও কোমলতায় পরিপূর্ণ, ২) তার হৃদয় পাষাণ নয়, মেজাজ কড়া বা রুক্ষ নয়, ৩) সাথীদের প্রতি নিজেও ক্ষমা প্রদর্শন করবে, আল্লাহর কাছেও তাদের জন্যে ক্ষমা চাইবে, ৪) তাদের সাথে পরামর্শ করবে, ৫) কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দৃঢ় পদক্ষেপ নেবে, দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দেবে। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের ফলে এক অনড়-অবিচল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে।

সূরায়ে ফাতহের শেষ দিকে আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাথীদের অর্থাৎ নেতা ও কর্মীদের কয়েকটি বিশেষ গুণের বর্ণনা এক সাথেই করেছেন এবং দ্বীন বিজয়ী হবেই– এমন একটা ঘোষণার সাথে সাথেই এই গুণগুলোর বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا. مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ.

তিনি তো আল্লাহই যিনি রাসূল পাঠিয়েছেন হেদায়েত ও দ্বীনে হক সহকারে যাতে তাকে সমস্ত দ্বীনসমূহের উপর বিজয়ী করতে পারে। এই ব্যাপারে আল্লাহর সাক্ষ্য যথেষ্ট। মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাথী-সঙ্গীগণ কাফেরদের মোকাবিলায় কঠোর এবং পরস্পরের প্রতি রহমদিল। যখনই তাদের দেখতে পাবে তারা হয় রুকু, সেজদা বা আল্লাহর ফজল এবং রেজামন্দি তালাশে নিয়োজিত আছে। তাদের চেহারায় সেজদার ছাপ বিদ্যমান যা দ্বারা তাদের সহজেই চেনা যায়। (আল ফাতহ : ২৮-২৯)

এখানে কঠোর কোমলের অদ্ভুত সমাবেশ। এমন দু'টি বিপরীতমুখী গুণের সফল প্রয়োগ সীমা লজ্ঘন না করা, ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব একমাত্র আল্লাহর সাহায্যেই। তাইতো এই গুণের অধিকারী নেতা কর্মী সবাই আল্লাহর সমীপে সেজদায় অবনত হয়ে অনবরত তাঁর ফজল সন্তুষ্টির কামনায় ব্যস্ত ও নিয়োজিত থাকে।

আল কোরআন উপরের যে সব গুণের কথা আলোচনা করেছে মুহাম্মদ (সা.) ইসলামী কাফেলার নেতা হিসেবে ঐ সবের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। ইসলামী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের সাধ্যমত এই উসওয়ায়ে হাসানার সফল অনুসরণের প্রয়াস পেতে হবে।

হাদিসে রাসূলের আলোকে নেতৃত্বের গুণাবলী

عَنْ عَوْف بْنِ مَالِك رضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وسَلَّمَ يَقُوْلُ خِيَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰه اَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ قَالَ لاَ مَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلٰوةَ لاَ مَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلٰوةَ -

হযরত আওফ ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি তোমাদের ঐসব নেতারাই উত্তম নেতা

যাদেরকে তোমরা ভালবাস এবং তারা তোমাদেরকে ভালবাসেন। তোমরা তাদের জন্যে দোয়া কর আর তারা তোমাদের জন্যে দোয়া করে। আর তোমাদের ঐসব নেতারাই নিকৃষ্ট নেতা যাদের প্রতি তোমরা বিক্ষুব্ধ এবং তারাও তোমাদের প্রতি বিক্ষুব্ধ। হযরত আওফ বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তাদেরকে কি আমরা পদচ্যুত করতে পারবো না? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করবে।

اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا وَلّٰى عَلَيْهِمْ حُلَمَاءَهُمْ وَقَضٰى بَيْنَهُمْ عُلَمَاءَهُمْ وجَعَلَ الْمَالَ فِىْ سُمَحَائِهِمْ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ شَرًّا وَلّٰى عَلَيْهِمْ سُفَهَاءَهُمْ وَقَضٰى بَيْنَهُمْ جُهَّالَهُمْ وجَعَلَ الْمَالَ فِىْ بُخَلَائِهِمْ۔

আল্লাহ যখন কোন জাতির কল্যাণ চান, তখন তাদের উপর সহনশীল লোকদের নেতৃত্ব দান করেন, তাদের মধ্যকার বিচার-ব্যবস্থা, দায়িত্ব জ্ঞানী লোকদের উপর অর্পণ করেন এবং অর্থ-সম্পদ দান করেন দানশীল লোকদেরকে। আর যখন কোন জাতির অকল্যাণ চান তখন তাদের উপর নির্বোধ লোকদের নেতৃত্ব চাপিয়ে দেন। তাদের মধ্যে বিচার-ফায়সালার দায়িত্ব অজ্ঞ লোকদের উপর অর্পণ করেন এবং ধন-সম্পদ দান করেন কৃপণ লোকদের হাতে। (দায়লামী)

عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ رضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ فَقَالَ لَهُ يَابُنَىَّ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ فَاِيَّاكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ –

হযরত আয়েজ ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, একদিন হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ আমার কাছে এসে বললেন, বাপু হে শোন! আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি, নিকৃষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তি হলো রাগী বদমেজাজী ব্যক্তি (অর্থাৎ পাষাণ দিলের মানুষ, যে তার অধীনস্থ লোকদের উপর শুধু জুলুম করে, তাদের সাথে কখনো নরম ব্যবহার করে না, দরদ দেখায় না)

খবরদার! আমি তোমাকে সাবধান করছি– তুমি যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত না হও। (বুখারী ও মুসলিম)

عنْ عَائِشَةَ رضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ سمِعْتُ رسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُوْلُ فِى بَيْتِى هذَا اَللّٰهُمَّ منْ وَلِى مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَشَقَّقَ عَلَيْهِمْ فَاشْفِقْ عَلَيْهِ ومنْ وَلِى مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفَقْ بِهِ ـ

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি আমার ঘরে আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি (তিনি এই বলে দোয়া করেছেন), হে আল্লাহ! আমার উম্মতের কোন সামষ্টিক কার্যক্রমের কোন বিষয়ে যদি কেউ দায়িত্বশীল নিযুক্ত হয়, অতঃপর তাদের প্রতি কঠোর আচরণ করতে থাকে– তাহলে তুমি তার প্রতি কঠোর আচরণ করবে। আর যদি কেউ আমার উম্মতের কোন বিষয়ের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাদের সাথে নরম ব্যবহার করে, তাহলে তুমিও তাদের সাথে নরম ব্যবহার করবে। (মুসলিম)

عَنْ عَائِشَةَ رضِىَ اللّٰهُ تَعَالى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الاَمْرِ كُلِّهِ.

আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ নরম আচরণকারী এবং যাবতীয় কার্যক্রমে তিনি নরম আচরণই পছন্দ করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

وَعَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ يُعْطِىْ عَلٰى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِىْ عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لاَيُعْطِىْ عَلى مَاسِوَاهُ ـ

হযরত আয়েশা (রা.) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ

দরদী– তিনি দরদপূর্ণ আচরণই পছন্দ করেন। তিনি দরদপূর্ণ আচরণের বিনিময়ে এমন কিছু দিয়ে থাকেন যা রাগী বদমেজাজী লোকদের কখনও দেন না। এমন কি আল্লাহ তার ঐ বিশেষ দান, বিশেষ অনুগ্রহ আর কোন কিছুর বিনিময়েই দেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ كُلَّهُ ـ

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নরম ব্যবহার বা দরদপূর্ণ ব্যবহার থেকে বঞ্চিত সে প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত। (মুসলিম)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ قَطُّ اِلاَّ اَخَذَ اَيْسَرَهُمَا مَالَمْ يَكُنْ اِثْمًا فَاِنْ كَانَ اِثْمًا كَانَ اَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِىْ شَىْءٍ قَطُّ اِلاَّ إِذَا أُنْتُهِكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ تَعَالٰى–

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট কোন দু'টি কাজের মধ্যে একটি বাছাই করার এখতিয়ার যদি দেয়া হতো তাহলে তিনি অপেক্ষাকৃত সহজটাই গ্রহণ করতেন, যদি না সেটা কোন গুণাহের কাজ হতো। যদি কোন গুণাহের কাজ হতো তাহলে তিনি ছিলেন তা থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান গ্রহণকারী। রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনও ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। হ্যাঁ, যদি কখনও আল্লাহপাকের নিষিদ্ধকৃত কোন ব্যাপারে কেউ জড়িয়ে পড়েছে, আল্লাহ প্রদত্ত সীমা লঙ্ঘনের প্রয়াস পেয়েছে– তখন তিনি নিছক আল্লাহর জন্যেই প্রতিশোধ নিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا بَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا ـ

হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সহজ কর, কঠিন করো না, সুসংবাদ দাও .... বীতশ্রদ্ধ করো না। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصِنِيْ قَالَ "لاَتَغْضَب فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ "لاَ تَغْضَبْ"

হযরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)কে বলল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। উত্তরে রাসূল (সা.) বললেন, রাগ করবে না, একথা কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, রাগান্বিত হবে না। (বুখারী)

لاَيَنْبَغِيْ لِلرَّجُلِ اَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهِى عَنِ الْمُنْكَرِ حَتّٰى يَكُوْنَ فِيْهِ ثَلاَثُ خِصَالٍ، رَفِيْقٌ بِمَا يَأْمُرُ، عَالِمٌ بِمَا يَنْهى ، عَادِلٌ فِيْمَا يَنْهِى ـ

তিনটি গুণের অধিকারী না হয়ে কোন ব্যক্তির আমর বিল মা'রূফ এবং নেহী আনিল মুনকারের কাজে আত্মনিয়োগ করা উচিত নয়। গুণ তিনটি এই (১) যাকে হুকুম দেবে বা নিষেধ করবে, তার প্রতি দরদী, সংবেদনশীল হতে হবে। (২) যে ব্যাপারে নিষেধ করবে সে বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হবে। (৩) যে ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করবে, সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ইনসাফ করতে সক্ষম হতে হবে। (দায়লামী, মিনহাজুস সালেহীন)

اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظًا مِّنْ نَفْسِهِ يَأْمُرُهُ وَيَنْهَاهُ ـ

"যখন আল্লাহ তার কোন বান্দার কল্যাণের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার মনকে তার জন্যে নছিহতকারী বানিয়ে দেন, মনই তাকে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করে আর খারাপ কাজে বাধা দান করে। অথবা এর অর্থ এও হতে পারে যে, সে ভাল

কাজের উপর আমল করে খারাপ কাজ বর্জন করে নমুনা পেশ করে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়।" (দায়লামী, মিনহাজুস সালেহীন)

রাসূল পাক (সা.) থেকে অনুরূপ আরও বহু নছিহতপূর্ণ হাদিস রয়েছে। আল্লাহর কোরআনে তাঁর যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, তিনি বাস্তব জীবনে নিজে এর চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন এবং তাঁর সাথী-সঙ্গীদের মাধ্যমে যুগ-যুগান্তরের মানুষের জন্যে সেই উত্তম আখলাকের কথা পৌছাবার, এর উপর আমল করার তাকিদ করেছেন। আমাদের সমাজে একটা ভুল ধারণা কাজ করছে যে, নেতৃস্থানীয় লোকদের ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতিই হয় না একটু মেজাজ না দেখালে। তাই সাধারণতঃ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকদেরকে বদমেজাজী দেখা যায় অথবা বদমেজাজী লোকদেরকে ভুলে আমরা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হিসেবে গণ্য করে আসছি। রাসূলের (সা.) চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের পরিচয় কারও জানা আছে কি? কেবল দ্বীনি বিচারেই নয়, দুনিয়ার যে কোন মানদণ্ডেও তো তিনি সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। এই তো মাত্র সেদিন আমেরিকার জনৈক লেখক দুনিয়ার সেরা একশত ব্যক্তিত্বের উপর গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে রহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মদ (সা.)কেই শীর্ষস্থান দিতে বাধ্য হয়েছেন।

ইসলামী হুকুমাতের নেতা বা কোন দায়িত্বশীল হোক বা ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের দায়িত্বশীলই হোক তাকে রহমাতুল্লিল আলামীনের প্রতিনিধিত্ব মানতে হবে। সুতরাং তার সামনে ব্যক্তিত্বের মডেল হিটলার, মুসোলিনী তো হতেই পারে না– রহমতের প্রতীক, দয়া মায়ার মূর্ত প্রতীক মুহাম্মদ (সা.)ই হতে হবে। তাঁর শ্রেষ্ঠ সাথী মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর সম্পর্কে আমরা কি মূল্যায়ন করব। স্বয়ং মুহাম্মদ (সা.)-এর ভাষায় :

اَرْحَمُ اُمَّتِىْ اَبُوْ بَكْرٍ.

আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দয়াশীল হলো আবু বকর (রা.)।

নবী রাসূলগণের পরে এই শ্রেষ্ঠ মানুষটি রহমদিল। সবচেয়ে বেশী রহমদিল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব কোথাও ক্ষুণ্ন হয়েছে কি? রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পরবর্তী পরিস্থিতিতে তিনি কি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেননি? ভণ্ড নবীদের দমন করার ব্যাপারে, জাকাত অস্বীকারকারীদের সমুচিত শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে তিনি কি বলিষ্ঠতার পরিচয় দেননি?

হ্যাঁ, হযরত ওমর (রা.) অপেক্ষাকৃত শক্ত মনের ছিলেন। কিন্তু তিনি শক্ত ছিলেন আল্লাহর আদেশ-নিষেধের ব্যাপারেই– اَشَدُّهُمْ فِىْ اَمْرِ اللّٰهِ.

তবুও এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, তার খেলাফতের প্রস্তাবের সময় এই কঠোরতার জন্যে আপত্তি উঠেছিল। হযরত আবু বকর (রা.) বলেছিলেন, দায়িত্ব আসলে ঠিক হয়ে যাবে। দায়িত্ব পেয়েই তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে গিয়ে কাতর কণ্ঠে বলেছিলেন– আল্লাহ! আমার দিলকে নরম করে দাও। খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ইতিহাসের এই কঠোর ব্যক্তিত্বও জনসাধারণের প্রতি আচরণে দরদী মনের পরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

ঐ বাঞ্ছিত গুণাবলী অর্জনের উপায়

আল কোরআনে স্বয়ং আল্লাহর রাসূলের যেসব গুণের কথা বলা হয়েছে, হাদিসে রাসূলের তাকিদ অনুযায়ী– তাঁর উম্মতের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম পরিচালনা যারা করবে, তাদের মাঝে গুণ সৃষ্টির তাকিদ আল্লাহর রাসূল দিয়েছেন– সেই গুণ সৃষ্টি করার উপায় কি? এই সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে হয়, আল্লাহ স্বয়ং তাঁর রাসূল (সা.)কে রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্যে যোগ্যতা অর্জন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করার যে হেদায়াত দান করেছিলেন, তার অনুসরণই উত্তম বরং একমাত্র উপায়। আল্লাহ তায়ালার এই হেদায়াত আমরা পাই সূরায়ে মুদ্দাসসিরের প্রথম সাত আয়াতে এবং সূরায়ে মুয্‌যাম্মিলের প্রথম রুকুতে। মুদ্দাসসিরের প্রথম সাত আয়াতের শিক্ষণীয় দিক হলো– ১. দ্বিধা সংকোচ ও জড়তা কাটিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে মাঠে-ময়দানে দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত হতে হবে। ২. মানব জাতিকে খোদাহীন সমাজ ব্যবস্থা, সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিণাম ও পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক-সাবধান করার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। ৩. আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে বর্তমান অবস্থা পরিবর্তনের আহ্বান জানাতে হবে। ৪. এই কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্যে দা'য়ীর ব্যক্তিত্ব আকর্ষণীয় হতে হবে। আর সে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব গড়ার উপায় হিসেবে বাহ্যিক ও আত্মিক উভয় দিক দিয়ে পাক-পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে হবে। শারীরিক দিক দিয়ে পোশাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়ে এবং আচার ব্যবহার, আমল-আখলাকের দিক দিয়েও পূত পবিত্রতার অধিকারী হতে হবে। ৫. আল্লাহর আজাবের কারণ ঘটায় এমন সব কাজ বর্জন করে চলতে হবে। এই ব্যাপারে সদা সতর্ক, সাবধান থাকতে হবে। ৬. সৃষ্টি জগতে কারও

কাছে কোনদিন কোন প্রতিদানের আশায় কোন কাজ করা যাবে না। রবের জন্যে ধৈর্য ধারণ করবে।

সূরায়ে মুয্‌যাম্মিলের প্রথম রুকুর শিক্ষণীয় দিকগুলো নিম্নরূপ: ১. আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে রাত্রের কিছু অংশ (এক তৃতীয় অংশ, অর্ধেক বা তার কিছু কম বেশী) জাগার অভ্যাস গড়ে তুলবে। ২. আল্লাহর কিতাবের সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর জন্যে বুঝে বুঝে ধীরে ধীরে কোরআন অধ্যয়ন বা তেলাওয়াত করবে। এই তেলাওয়াত নামাজের মাধ্যমেও হতে পারে নামাজের বাইরেও হতে পারে। ৩. দিনের ব্যস্ততার মধ্যেও আল্লাহর জিকির করবে। ৪. দুনিয়ার সবকিছু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে একমাত্র আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার প্রয়াস চালাবে। ৫. যেহেতু আল্লাহ মাশরিক ও মাগরিবের রব, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। অতএব একমাত্র তাঁর উপর ভরসা করবে, একমাত্র তাঁকেই অভিভাবক বানাবে। ৬. প্রতিপক্ষের, বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতা, সমালোচনার মোকাবিলায় ধৈর্য ধারণ করবে। ৭. উত্তম আখলাকের মাধ্যমে তাদেরকে এড়িয়ে চলবে। ৮. বিরোধিতার নায়কদেরকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করবে।

নেতৃত্বের মৌলিক দায়িত্ব

ইসলামী নেতৃত্ব যেহেতু রাসূলের প্রতিনিধিস্থানীয় মর্যাদার অধিকারী, সুতরাং তার মৌলিক দায়িত্ব সেটাই যা আল্লাহর রাসূলকে আঞ্জাম দিতে হয়েছে। আল্লাহর রাসূলের মৌলিক কাজ কোরআন মজীদের তিনটি জায়গায় একই ভাষায় এসেছে।

সূরা আল বাকারায় হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দোয়া হিসেবে :

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

হে খোদা! এদের প্রতি এদের জাতির মধ্য হতে এমন একজন রাসূল প্রেরণ কর, যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করবেন এবং তাদের বাস্তব জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সুষ্ঠুরূপে গড়বেন। তুমি নিশ্চয়ই বড় শক্তিমান ও বিজ্ঞ। (আল বাকারা ১২৯)

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِىْ الْاُمِّيّنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ.

তিনিই যিনি উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল স্বয়ং তাদেরই মধ্য হতে দাঁড় করিয়েছেন যিনি তাদেরকে তার আয়াত শোনান তাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও সুগঠিত করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। (সূরা জুমআ : ২)

উক্ত আয়াতগুলোর আলোকে রাসূলের মৌলিক কাজ হিসেবে আল্লাহ চারটি কাজের কথা উল্লেখ করেছেন। ১. তেলাওয়াতে আয়াত ২. আল্লাহর কিতাবের তালিম ৩. হিকমতের তালিম ৪. তাজকিয়ায়ে নফস।

আজকের দিনে নায়েবে রাসূলের দায়িত্ব পালন যারা করতে চান, তাদেরকেও রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে ঐ দায়িত্বসমূহ আঞ্জাম দিতে হবে। যত পরিকল্পনা, যত কর্মসূচি, যত কর্মকৌশলই গ্রহণ করা হোক না কেন, তা এই মৌলিক কাজ সম্পাদনের জন্যেই করতে হবে যার স্বাভাবিক দাবী সংগঠনের আওতাভুক্ত লোকদের ঈমানের তরক্কির ব্যবস্থা করা, কোরআন সুন্নাহর শিক্ষাসমূহের বাস্তবপদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের ব্যবস্থা করা, সর্বোপরি তাদের আমল আখলাক উন্নত করার, আত্মশুদ্ধি ও আত্মিক উন্নতি লাভের ব্যবস্থা করা। এভাবে আল কোরআনের বাঞ্ছিত মান অনুযায়ী লোক তৈরি করতে পারাই একজন সংগঠকের প্রকৃত সফলতা।

নেতা ও কর্মীর সম্পর্ক

ইসলামী সংগঠনের নেতা ও কর্মীর সম্পর্ক বস্ ও সাবোর্ডিনেটের সম্পর্ক নয়, বা অফিসার ও কর্মচারীদের সম্পর্ক নয়। এই সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বের। নেতাও কর্মীকে ভ্রাতৃত্বের দাবী নিয়ে, দরদ নিয়ে, আবেগ অনুভূতি নিয়ে পরিচালনা করবে। কর্মীও নেতাকে ভ্রাতৃতুল্য ভক্তি শ্রদ্ধাসহ গ্রহণ করবে। আমরা বস্ ও নেতাদের মধ্যে কথা-কাজে, আচার-আচরণে নিম্নোক্ত পার্থক্য দেখতে পাই :

১. বস্ সাধারণত মেজাজ দেখিয়ে লোকদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে, আর নেতা তাদেরকে নম্র ব্যবহারের মাধ্যমে কাছে টানে।

২. বস্ সাধারণত আইনের ও কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল থাকে, আর নেতা

নির্ভর করে তার প্রতি কর্মী ও সাথী-সঙ্গীদের শুভেচ্ছা ও শুভ ধারণার উপর।

৩. বস্ তার অধীনস্থদের মনে তার সম্পর্কে এক ধরনের ভীতির ভাব সৃষ্টি করে তাদেরকে সন্ত্রস্ত করে রাখে– কিন্তু নেতা তার সহকর্মী ও সাথী-সঙ্গীদের মনে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

৪. বসের মধ্যে আমিত্বের প্রাধান্য থাকে এবং তার কথা-বার্তায় আমি আমি শব্দ বেশী বেশী উচ্চারিত হয়। নেতা সকলকে সাথে নিয়ে কথা বলেন, কাজ করেন, তাই তার কথায় আমির পরিবর্তে আমরা উচ্চারিত হয়ে থাকে।

৫. বস্ তার অধীনস্থদের যেখানে সময়মত আসার নির্দেশ দেয়, সেখানে নেতা সময়ের আগে উপস্থিত হয়।

৬. বস্ অধীনস্থদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে থাকে। আর নেতা অভিযোগ না এনে অচলাবস্থা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৭. বস্ কাজটা কিভাবে করতে হবে বলে দিয়েই দায়িত্ব শেষ মনে করে। আর নেতা কাজটা কিভাবে করতে হয় বাস্তবে তা দেখিয়ে দেয়।

৮. বস্ সাধারণত কাজের ব্যাপারে একঘেয়েমি সৃষ্টি করে থাকে, যার ফলে সহজ কাজও অনেক ক্ষেত্রে কঠিন মনে হয়। আর নেতা কঠিন কাজকে সহজ করে ফেলে সহকর্মীদের মনের আবেগ অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে।

৯. কাজ শেষে বিদায়ের মুহূর্তে বস্ যেখানে বলবে, তোমরা বা আপনারা চলে যান, সেখানে নেতা বলবে, চলুন আমরা যাই বা এবার আমরা যেতে পারি।

পঞ্চম অধ্যায়

আনুগত্য

আনুগত্য কাকে বলে?

আনুগত্য অর্থ মান্য করা, মেনে চলা, আদেশ ও নিষেধ পালন করা, উপরন্তু কোন কর্তৃপক্ষের ফরমান-ফরমায়েশ অনুযায়ী কাজ করা প্রভৃতি। আল কোরআনে এবং হাদিসে রাসূলে এর প্রতিশব্দ হিসেবে যেটা পাই সেটা হলো এতায়াত। এতায়াতের বিপরীত শব্দ হলো মাছিয়াত বা এছইয়ান। যার অর্থ নাফরমানী করা, হুকুম অমান্য করা প্রভৃতি।

প্রকৃত আনুগত্য বা প্রকৃত এতায়াত হলো সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর যাবতীয় হুকুম আহকাম মেনে চলা। এটাই মানুষের একমাত্র দায়িত্ব, কর্তব্য এবং করণীয় কাজ যা ইবাদত নামেই অভিহিত। এই প্রকৃত এতায়াতের ব্যবহারিক রূপ হলো :

أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الاَمْرِ مِنْكُمْ.

আল্লাহর এতায়াত কর, রাসূলের এতায়াত কর এবং উলিল আমরের এতায়াত কর। (আন নিসা : ৫৯)

مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ومَنْ عصَانِىْ فَقَدْ عَصى اللّٰهَ ومَنْ يُّطِعِ الاَمِيْر فَقَدْ اَطَاعَنِىْ ومَنْ عَصى الاَمِيْر فَقَدْ عصَانِىْ.

যে আমার এতায়াত বা আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে আমার হুকুম অমান্য করল, সে আল্লাহর হুকুমই অমান্য করল। যে আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমীরের আদেশ অমান্য করল, সে প্রকৃতপক্ষে আমারই আদেশ অমান্য করল। (বুখারী, মুসলিম)

উপরে উল্লিখিত কোরআনের ঘোষণা এবং হাদিসে রাসূলের আলোকে পরিষ্কার বুঝা যায়– আল্লাহর আনুগত্য রাসূলের মাধ্যমে। আর আল্লাহ ও রাসূল

উভয়ের আনুগত্য উলিল আমর বা আমীরের মাধ্যমে। তবে আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য শর্তহীন এবং নিরঙ্কুশ, উলিল আমর বা আমীরের আনুগত্য শর্ত সাপেক্ষ এবং আল্লাহ ও রাসূল প্রদত্ত সীমারেখার মধ্যে সীমিত।

ইসলামের সাথে আনুগত্যের সম্পর্ক

ইসলাম ও আনুগত্য অর্থের দিক দিয়ে এক ও অভিন্ন, তেমনি দ্বীন এবং এতায়াতও অর্থের দিক দিয়ে একটা অপরটার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলামের শাব্দিক অর্থও তাই আনুগত্য বা আত্মসমর্পণ করা, এতায়াত শব্দের অর্থ তাই। এভাবে দ্বীন শব্দটির চারটি অর্থ আছে, তার একটি আনুগত্য বা এতায়াত। দ্বীন ও ইসলাম যে বৃহত্তর আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থা উপস্থাপন করে, সেই আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থার মধ্যে দ্বীন ও ইসলামের আভিধানিক অর্থের, ধাতুগত অর্থের ছাপ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এই শাব্দিক অর্থের আলোকে দ্বীনের এবং ইসলামের অন্তর্নিহিত দাবী অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, এখানে আনুগত্যই মূল কথা। সুতরাং আমরা এটা বলতে পারি, ইসলামই আনুগত্য অথবা আনুগত্যই ইসলাম। দ্বীনের অপর নাম আনুগত্য। আনুগত্যেরই অপর নাম দ্বীন। যেখানে আনুগত্য নেই সেখানে দ্বীন নেই, ইসলাম নেই। যেখানে ইসলাম নেই, দ্বীন নেই, সেখানে আনুগত্য নেই। যার মধ্যে আনুগত্য নেই, বাহ্যত সে ইসলামের যত বড় পাবন্দই হোক না কেন, যতই দ্বীনদার হোক না কেন ,তার মধ্যে দ্বীন নেই, ইসলাম নেই। কারণ আনুগত্যই দ্বীন ইসলামের প্রাণসত্তা।

আনুগত্যের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা

কোরআনের ঘোষণা :

فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ

আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (আশ-শুআরা : ১৫০)

এখানে আল্লাহকে ভয় করে চলার এবং তার পছন্দনীয় পথে জীবন যাপন করার জন্যে রাসূলের আনুগত্যকে অপরিহার্য করা হয়েছে। আর এই দুটো শব্দ বিশিষ্ট নির্দেশ অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় কর, আমার আনুগত্য কর– মক্কার সূরাগুলোতে বার বার এসেছে।

কোরআনে হাকীমের আরও ঘোষণা :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى

الاَمْـرِ مِنْكُمْ ج فَـاِنْ تَنَازَعْـتُمْ فِىْ شَـيْئٍ فَـرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُـوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَـوْمِ الاٰخِـرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً ـ

হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য কর খোদার, আনুগত্য কর রাসূলের এবং সেসব লোকেরও যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কোন ব্যাপারে মতবিরোধের সৃষ্টি হয় তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতই খোদা ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক। এটাই সঠিক কর্মনীতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটাই উত্তম। (আন নিসা : ৫৯)

اِنَّمَا كَانَ قَـوْلَ الْمُـؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُـوْآ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُـوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ـ

ঈমানদার লোকদের কাজতো এই যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ডাকা হবে– যেমন রাসূল তাদের মামলা মুকাদ্দমার ফায়সালা করে দেয় তখন তারা বলে : আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। (আন-নূর : ৫১)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَمُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ـ

কোন মুমিন পুরুষ ও কোন মুমিন স্ত্রীলোকেরও এই অধিকার নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে ফায়সালা করে দেবে, তখন সে নিজেই সেই ব্যাপারে কোন ফায়সালা করার ইখতিয়ার রাখবে। (আল আহযাব : ৩৬)

এখানে লক্ষণীয় এই এতায়াতকে আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমানের অনিবার্য দাবী হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

হাদিসে রাসূলে বলা হয়েছে: :

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا

أَحَبَّ وَكَرِهَ اِلاَّ اَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَطَاعَةَ ـ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুসলমানদের উপর নেতার আদেশ শোনা ও মানা অপরিহার্য কর্তব্য। চাই সে আদেশ তার পছন্দনীয় হোক, আর অপছন্দনীয় হোক। তবে হ্যাঁ, যদি আল্লাহর নাফরমানীমূলক কোন কাজের নির্দেশ হয় তবে সেই নির্দেশ শোনা ও মানার কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ اَبِى الْوَلِيْدِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِىْ الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمُكْرَهِ وَعَلٰى اَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلٰى اَنْ لاَ تُنَازِعَ الاَمْرَ اَهْلَهُ اِلاَّ اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْهِ بُرْهَانٌ وَعَلٰى اَنْ نَقُوْلَ الْحَقَّ اِنَّمَا كُنَّا لاَنَخَافُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ.

হযরত আবু অলিদ ওবাদা ইবনে ছামেত (রা.) বলেন, আমরা নিম্নোক্ত কাজগুলোর জন্যে রাসূলের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলাম : ১. নেতার আদেশ মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে– তা দুঃসময়ে হোক, আর সুসময়ে হোক। খুশীর মুহূর্তে হোক, আর অখুশীর মুহূর্তে হোক। ২. নিজের তুলনায় অপরের সুযোগ-সুবিধাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ৩. ছাহেবে আমরের সাথে বিতর্কে জড়াবে না, তবে হ্যাঁ, যদি নেতার আদেশ প্রকাশ্য কুফরীর শামিল হয় এবং সে ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যথেষ্ট দলিল প্রমাণ থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। ৪. যেখানে যে অবস্থাতেই থাকি না কেন হক কথা বলতে হবে। আল্লাহর পথে কোন নিন্দুকের ভয় করা চলবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

এখানে আল কোরআন এবং হাদিসে রাসূল (সা.)-এর আলোকে আনুগত্যের যে গুরুত্ব এবং অপরিহার্যতা আমরা বুঝতে পারি, মানুষের সমাজ জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমন কি প্রাণীজগতেও এর বাস্তবতার ও যথার্থতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ক্ষুদ্র একটা পরিবার থেকে শুরু করে বিভিন্নমুখী প্রতিষ্ঠানের গঠনমুখী কার্যক্রম প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের আনুগত্যের উপরই নির্ভরশীল। বিশেষ করে যে কোন আন্দোলনের, সংগঠনের জন্যে আনুগত্যই চালিকাশক্তি বা প্রাণশক্তির ভূমিকা পালন করে।

ইসলামে আনুগত্য ও শৃঙ্খলার গুরুত্ব আরো অনেক বেশী। ইসলামের এই আনুগত্য ও শৃঙ্খলাকে অনেকে আবার অবাস্তব অসম্ভবও মনে করতে চান। তাদের মনকে সন্দেহ-সংশয় মুক্ত করার জন্যে ইসলামের বাইরেও যে এর গুরুত্ব স্বীকৃত এর বাস্তব পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন আছে।

ইসলামের বিজয়ের শুভ সংবাদ, বিশ্বজোড়া খেলাফতের ওয়াদা, আল্লাহর পক্ষ থেকে সূরায়ে নূরের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে। এই ওয়াদার আগে ঈমানদারদের যে পরিচয় দেয়া হচ্ছে, তাতে আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা দেখাবার কথাই উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে মুমিনদের একমাত্র পরিচয় হলো যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে কোন ফরমান শুনার জন্যে ডাকা হয় তখন তাদের মুখ থেকে মাত্র দু'টি শব্দই উচ্চারিত হয়। একটা হলো, আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনলাম; দ্বিতীয়টা হলো, মাথা পেতে এই নির্দেশ মেনে নিলাম। এইরূপ দ্বিধাহীন নির্ভেজাল আনুগত্যই সাফল্যের চাবিকাঠি।

আনুগত্যহীনতার পরিণাম

আল কোরআন ঘোষণা করেছে:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের অনুসরণ কর আর নিজেদের আমল বিনষ্ট করো না। (মুহাম্মদ : ৩৩)

এই আয়াতের পূর্বাপর যোগসূত্র এবং নাযিলের পরিবেশের দৃষ্টিতে এর অর্থ দাঁড়ায়, আনুগত্যহীনতা সমস্ত নেক আমলকে বরবাদ করে দেয়। নবী (সা.)-এর পেছনে জামায়াতের সাথে নামাজ পড়েছে তারাই যখন যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ অমান্য করল, তাদের সমস্ত আমল ধূলায় মিশে গেল। আল্লাহ তাদেরকে মুনাফিক নামে ঘোষণা করলেন।

কোরআন পাকের আরও ঘোষণা :

فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَيَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ.

অথচ তোমরা তাদের প্রতি রাজী ও সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ্ তো কিছুতেই ফাসেকদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। (আত তাওবা : ৯৬)

এই আয়াতের আলোকে বুঝা যাচ্ছে আনুগত্যহীনতার পরিণামে আল্লাহর রেজামন্দী থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

কোরআন আরও ঘোষণা করে :

وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ط وَمَاعَلَى الرَّسُوْلِ اِلاَّالبَلاَغُ الْمُبِيْنُ.

যদি তোমরা রাসূলের আনুগত্য কর, তাহলে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আমার রাসূলের দায়িত্ব তো শুধুমাত্র দ্বীনের দাওয়াত সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া। (আন নূর : ৫৪)

এই আয়াতে পরোক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে– আনুগত্য প্রদর্শনে ব্যর্থ হলে হেদায়াত লাভের খোদা প্রদত্ত তৌফিক থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

হাদিসে রাসূলে বলা হয়েছে :

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجِمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً ـ

যে আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায় এবং জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অতঃপর মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু হয় জাহেলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম)

উক্ত হাদিসে প্রথমতঃ আনুগত্যহীনতাকে জামায়াত ত্যাগের শামিল বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এর পরিণাম হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু।

আরও বলা হয়েছে :

مَنْ كَرِهَ مِنْ اَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً–

যদি কেউ তার আমীরের মধ্যে অপছন্দনীয় কোন কাজ দেখতে পায় তাহলে যেন ছবর করে। (আনুগত্য পরিহার না করে) কেননা যে ইসলামী কর্তৃপক্ষের

আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমাণ সরে যায় বা বের হয়ে যায় তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু। (আল হাদিস)

উক্ত হাদিসে প্রথমতঃ আনুগত্যহীনতাকে জামায়াত ত্যাগের শামিল বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এর পরিণাম হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু।

আরও বলা হয়েছে :

عَنْ اِبْنِ عُمَر رضِيَ اللّٰهُ تَعَالى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ منْ خَلَعَ يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللّٰهَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَحُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَات وَلَيْس فِىْ عُنُقِه بَيْعَةٌ مَات مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً ـ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) রাসূলে পাক (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আনুগত্যের বন্ধন থেকে হাত খুলে নেয়, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, নিজের আত্মপক্ষ সমর্থনে তার বলার কিছুই থাকবে না। আর যে ব্যক্তি বাইয়াত ছাড়া মারা যাবে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম)

এই হাদিসেও আনুগত্য প্রদর্শনে অপারগতাকে বাইয়াতহীনতার শামিল বুঝানো হয়েছে– যার ফলে জাহেলিয়াতের মৃত্যু এবং আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে অক্ষম হওয়া।

দ্বীনি ও ঈমানী দৃষ্টিকোণ থেকে আনুগত্যহীনতার এই পরিণামের পাশাপাশি এর জাগতিক কুফল, শান্তি-শৃঙ্খলাহীনতা, অরাজকতা, ঐক্য-সংহতির বিঘ্ন হওয়া প্রভৃতির উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ আমাদেরকে আনুগত্যহীনতার এই উভয়বিধ কুফল থেকে হেফাজত করুন।

আনুগত্যের দাবী

আমরা দ্বীন ও ইসলামের সাথে আনুগত্য বা এতায়াতের যে সম্পর্ক দেখিয়েছি, তার আলোকেই বলতে হয়, ইসলামের বাঞ্ছিত আনুগত্য তাকেই বলা যাবে, যেটা হবে মনের ষোলআনা ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে, পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সহকারে, স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা সহকারে। কোন প্রকারের কৃত্রিমতা বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব,

সংকোচ-সংশয়ের কোন ছাপ বা পরশ থাকতে পারবে না। এই আনুগত্য প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতা মাত্র হলে চলবে না। কোন নির্দেশ বা সিদ্ধান্তের আক্ষরিক দিকটাই কেবল বাস্তবায়ন করলে চলবে না, উক্ত নির্দেশ বা সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত দাবী মন-মগজ দিয়ে উপলব্ধি করে নিষ্ঠার সাথে এবং সাধ্যমত সর্বোত্তম উপায়ে বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহর কোরআন এই প্রসঙ্গে ঘোষণা করেছে :

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

আপনার রবের কসম! তারা কখনও ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ, মামলা-মুকাদ্দমার ব্যাপারে একমাত্র আপনাকেই ফায়সালা দানকারী হিসেবে গ্রহণ করবে, অতঃপর আপনার দেয়া সিদ্ধান্তের প্রতি তাদের মনে দ্বিধা-সংশয় থাকবে না এবং ঐ সিদ্ধান্ত সর্বোত্তম উপায়ে মাথা পেতে নেবে। (আন নিসা : ৬৫)

মুনাফিকদের আনুগত্যের দাবীর কৃত্রিমতা প্রসঙ্গে সূরায়ে নূরে আল্লাহ বলেছেন

لاَتُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ ۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ-

বলে দিন হে নবী! কসম খেয়ে আনুগত্য প্রমাণের তো কোন প্রয়োজন নেই। আনুগত্যের ব্যাপারটা তো খুবই পরিচিত ব্যাপার। সন্দেহ নেই, আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে অবগত আছেন। (আন নূর : ৫৩)

আনুগত্যের পূর্বশর্ত

আল্লাহ তায়ালা আল কোরআনে এবং নবী (সা.) হাদিসে যত জায়গায় এই আয়াত উল্লেখ করেছেন, তার প্রায় সব জায়গাতেই এই আয়াতের আগে সামায়াত শব্দটা ব্যবহার করেছেন, যার শাব্দিক অর্থ হলো শোনা, শ্রবণ করা। বলা হয়েছে وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا শোন এবং মান سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا শুনলাম এবং মানলাম। যে হাদিসটির মাধ্যমে আমরা জামায়াতী জিন্দেগীর পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাই সেখানে বলা হয়েছে :

"اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَلْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি জিনিসের নির্দেশ দিচ্ছি– জামায়াতের, শুনার এবং আনুগত্য করার, হিজরত এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্যে।'এখানে এতায়াতের আগে জামায়াতের কথা বলা হয়েছে। এই থেকেও পরিষ্কার হয় যে, কোন নির্দেশ ও কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হলে সেই সিদ্ধান্তটা কি তা আগে ভালভাবে জানা ও বুঝা দরকার। কোন কিছুর উপর সঠিকভাবে আমল তো তখনই সম্ভব হবে যখন ব্যাপারটা সম্পর্কে, এর গুরুত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হবে। শুধু নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত আক্ষরিকভাবে জানলেও যথেষ্ট হয় না। এর অন্তর্নিহিত দাবী এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। তাই কোন সিদ্ধান্ত তা মৌখিক হোক অথবা লিখিত হোক, আসার সাথে সাথে মনোযোগ দিয়ে তা জানার ও বুঝার চেষ্টা করতে হবে, এর গুরুত্ব তাৎপর্যও হৃদয় দিয়ে উপলব্ধির চেষ্টা করতে হবে। কোথাও কোন ব্যাপারে অস্পষ্টতা থাকলে, বা বুঝে না আসলে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে, অস্পষ্টতা দূর করে সঠিক বুঝ হাসিলের চেষ্টা করতে হয়। রাসূলের শেখানো দোয়া :

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَّارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ.

হে আল্লাহ! আমাদের হককে হক হিসেবে দেখান আর তৌফিক দিন তার অনুসরণ করার এবং বাতিলকেও বাতিল হিসেবে দেখান আর তৌফিক দিন তাকে বর্জন করার।

এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি? হকের অনুসরণ করার জন্যে হককে হক হিসেবে চিনতে পারা অপরিহার্য। বাতিলকে বর্জন করতে হলে তেমনি বাতিল সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা জরুরী। এমনিভাবে যে কোন জিনিসের গ্রহণ বর্জনের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। কোন সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং অনুসরণের ব্যাপারটা উক্ত সিদ্ধান্ত জানা, বুঝা এবং গুরুত্ব ও পদ্ধতিগত জ্ঞানের উপরই নির্ভরশীল।

ওজর পেশ করা গুণাহ্

ইসলামী আন্দোলনের সারকথা– এটা ঈমানের দাবী, নাজাতের উপায় এবং মুসলমানের প্রধানতম কর্তব্য। সুতরাং এই কর্তব্য পালনের পথ করে নেয়া বা সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করাই ব্যক্তির দায়িত্ব। এভাবে যারা সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়, আল্লাহ্ তাদেরকে সুযোগ করে দেন। আল্লাহ্ পাকের ঘোষণা রয়েছে :

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.

যারা আমার রাস্তায় সংগ্রাম-সাধনা করে আমি তাদের পথ করে দেই। (আল আনকাবূত : ৬৯)

ومَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ–

যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্ তার পথ করে দেন– এমন উপায়ে তার রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন যা কল্পনাও করা যায় না। (আত তালাক : ২, ৩)

অভাব, অভিযোগ ও অসুবিধা প্রত্যেকের কিছু না কিছু থাকেই এবং যার যার বিচারে নিজের সমস্যাই বড় করে দেখা মানুষের একটি প্রকৃতিগত দুর্বলতা। ঈমানের দাবী হলো, এসব অভাব-অভিযোগ বা অসুবিধা, বাধা-প্রতিবন্ধকতাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করে এর অজুহাতে কাজ থেকে অব্যাহতি না চেয়ে বরং আরো বেশী বেশী করা। আল্লাহর কালামের ঘোষণা :

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط ومَنْ يُّؤْمِنْ م بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ–

কোন বিপদ-মুছিবত আল্লাহর অনুমোদন বা নির্দেশ ছাড়া আসতে পারে না। যারা আল্লাহর প্রতি সঠিক ঈমান এনেছে তাদের দিলকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেন। (আত তাগাবুন : ১১)

অর্থাৎ তাদের দিল এই ব্যাপারে সঠিক বুঝ পেয়ে যায় এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এটা অজুহাত হিসেবে নিয়ে কাজ থেকে দূরে থাকার চিন্তা করে না।

আল কোরআনের ঘোষণায় এক পর্যায়ে এভাবে ওজর পেশ করে কোন নির্দেশ পালন থেকে অব্যাহতি চাওয়াকে ঈমানের পরিপন্থী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যত্র অনুমতি প্রার্থনার সুযোগ দেয়া হয়েছে বটে কিন্তু আলোচনার ধরন-প্রকৃতি ভালভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করলে দেখা যায়, অনুমতি চাওয়াকে অপছন্দ করা হয়েছে– এটা গুণাহর কাজ এই বলে সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিতও দেয়া হয়েছে যে :

لاَيَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ–

যারা আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে, তারা কখনো আল্লাহর পথে জানমাল দিয়ে জিহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি চাইবে না। (সূরা তাওবা : ৪৪)

সূরায়ে নূরে কথাটা অন্যভাবে আনা হয়েছে। বলা হয়েছে :

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ ورسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَأْذِنُوْهُ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يستَأْذِنُوْنَكَ اُوْلٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج فَاِذَا اسْتَأْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

মুমিন তো প্রকৃতপক্ষে তারাই যারা আল্লাহ ও রাসূলকে অন্তর থেকে মানে। আর যখন কোন সামষ্টিক কাজ উপলক্ষে রাসূলের সাথে থাকে, তখন অনুমতি না নিয়ে কোথাও যায় না। হে নবী! এভাবে যারা আপনার কাছ থেকে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ ও রাসূলকে মান্য করে চলে। অতএব তারা যখন কোন ব্যাপারে অনুমতি কামনা করে তাহলে তাদের মধ্য থেকে যাকে চান অনুমতি দিতে পারেন এবং এরূপ লোকদের জন্যে আল্লাহর কছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (আন নূর : ৬২)

এখানে সূরা নূরের আয়াতটি মূলত মুনাফিকদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যারা দায়িত্ব ও কর্তব্যে ফাঁকি দেয়ার মন-মানসিকতা নিয়ে অনুমতি চাইত। এই

মন-মানসিকতাসহ ওজর পেশ ও অনুমতি অব্যাহতি কামনা আসলেই ঈমানের পরিপন্থী। সূরা নূরের কথাটা কোন মৌলিক সিদ্ধান্তের ওপর আমল করা থেকে অব্যাহতি কামনা করা নয় বরং কোন সামষ্টিক কার্যক্রম থাকা অবস্থায় সেখান থেকে সাময়িক প্রয়োজনে একটু এদিক ওদিক যাওয়া আসার মধ্যেও সীমাবদ্ধ। এখানে জামায়াতী শৃঙ্খলার ব্যাপারটাই প্রধান। সে ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়, যারা কোন কারণে অনুমতি প্রার্থনা করবে তাদের সবাইকে অনুমতি দিতে বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে যাদের আপনি অনুমতি দিতে চান। দ্বিতীয়তঃ বলা হয়েছে, তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে দোয়া করবেন।

ওজর পেশের সঠিক পদ্ধতি হলো, ব্যক্তি নিজে এই ওজরের কারণে কাজ না করার ফায়সালা নেবে না। বরং শুধু সমস্যাটা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবে। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত যাই আসুক তাতেই কল্যাণ আছে, এই আস্থা রাখবে।

আনুগত্যের পথে অন্তরায় কি কি

আনুগত্য প্রদর্শনে যারা ব্যর্থ হয়, তারা আত্মপক্ষ সমর্থনে অনেক অজুহাত পেশ করে থাকে। অনেক সুবিধা অসুবিধার কথা বলে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এগুলোর স্বীকৃতি দেন না। তার পক্ষ থেকে আনুগত্যহীনতার কারণ হিসেবে পরকালের জবাবদিহির অনুভূতির অভাব, আখেরাতের জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়ার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআন বলছে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ج فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ قَلِيْلٌ.

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে বের হতে বলা হলো তোমরা মাটি কামড়িয়ে পড়ে থাকলে? তোমরা কি আখেরাতের মোকাবিলায় দুনিয়ার জীবনকেই পছন্দ করে নিলে? যদি এমনই হয়ে থাকে তাহলে জেনে নিও, দুনিয়ার এইসব বিষয় সামগ্রী আখেরাতে অতি তুচ্ছ ও নগন্য হিসেবে পাবে। (আত তাওবা : ৩৮)

كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ.

কখনও না, বরং প্রকৃত ব্যাপার হলো, তোমরা প্রতিফল দিবসের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ কর। (আল ইনফিতার : ৯)

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى -

বরং তোমরা তো দুনিয়ার এই পার্থিব জীবনকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাক। অথচ আখেরাতের জীবনই উত্তম ও স্থায়ী। (আল আ'লা : ১৬-১৭)

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ

তোমাদেরকে বেশী বেশী করে দুনিয়া ভোগ করার প্রবণতা এবং একে অপরকে এই ব্যাপারে ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার মানসিকতা গাফলতির মধ্যে নিমজ্জিত করে রেখেছে। (আত তাকাসুর : ১)

আল কোরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহের আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আখেরাতের অনুভূতির অভাব এবং দুনিয়া পূজার মনোভাবই আনুগত্যহীনতার প্রধানতম কারণ। দ্বিতীয় পর্যায়ের কারণ হিসেবে আসে যার যার জায়গায় নিজ নিজ দায়িত্বের যথার্থ অনুভূতির অভাব। সেই সাথে বিভিন্ন কাজের বা সিদ্ধান্তের গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিক চেতনার (Proper motivation)-এর অভাব। কাজটা হলে কি কি কল্যাণ বা লাভ হবে, না করলে কতটা ক্ষতি ব্যক্তির হবে, কতটা ক্ষতি আন্দোলন ও সংগঠনের হবে– এই চেতনা ও উপলব্ধির অভাবও সাধারণভাবে আনুগত্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

উপরে বর্ণিত কারণ ছাড়াও কিছু মারাত্মক ও ক্ষতিকর কারণ রয়েছে, যেগুলোর কারণে জেনে বুঝেও মানুষ আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয়।

এক: গর্ব, অহঙ্কার, আত্মপূজা ও আত্মম্ভরিতা।

গর্ব-অহঙ্কার মূলত ইবলিসি চরিত্র। ইবলিস আল্লাহর হুকুম পালনে ব্যর্থ হলো কেন?

আল্লাহ বলেন : اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ

সে হুকুম পালনে অস্বীকার করল এবং অহঙ্কার প্রদর্শন করল। (আল বাকারা ৩৪)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ -

আল্লাহ কখনও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। (লুকমান : ১৮)

হাদিসে কুদসীতে বলা হয়েছে– আল্লাহ বলেন : অহঙ্কার তো আমার চাদর

(একমাত্র আমার জন্যেই শোভনীয়)। যে অহঙ্কার করে, সে প্রকৃতপক্ষে আমার চাদর নিয়েই টানাটানি করতে ব্যর্থ প্রয়াস পায়।

মানুষের দুর্বলতার এই ছিদ্রপথ বেয়ে ইবলিস সুযোগ গ্রহণ করে, তার মনে আবার হাজারো প্রশ্ন তুলে দেয়– সিদ্ধান্ত কে দিল? হুকুম আবার কার মানব? আমি কি, আর সে কে? এই অবস্থায় মানুষের উচিত ইবলিসের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়া, তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। এটা একটা রোগ মনে করে, ইবলিসি প্রতারণা মনে করে কেউ যদি কাতর কণ্ঠে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় তাহলে আল্লাহ সে ফরিয়াদ শুনে থাকেন, তাঁর বিপন্ন বান্দাকে সাহায্য করে থাকেন। আল্লাহ পাকের ঘোষণা :

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

যদি তোমরা শয়তানের পক্ষ থেকে কোন উস্কানি অনুভব কর, তাহলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা কর। তিনি তো অবশ্য সব কিছু শোনেন এবং জানেন। (হা-মীম আস সাজদা : ৩৬)

দুই : এই পর্যায়ের দ্বিতীয় কারণ– হৃদয়ের বক্রতা যা সাধারণত সৃষ্টি হয়ে থাকে দায়িত্ব এড়ানোর কৌশলস্বরূপ নানারূপ জটিল কুটিল প্রশ্ন তোলার বা সৃষ্টির মাধ্যমে। মূসা (আ.)-এর কওম সম্পর্কে আল্লাহ সূরায়ে সফে বলেছেন :

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِىْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ط فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ–

মূসা (আ.)-এর কথা স্মরণ কর, যখন তিনি তার কওমকে লক্ষ্য করে বললেন, আমাকে তোমরা পীড়া দিচ্ছ কেন বা উৎপীড়ন করছ কেন? অথচ তোমরা তো জান যে, আমি আল্লাহর রাসূল। এরপরও যখন তারা বাঁকা পথে পা বাড়াল, আল্লাহ তাদের দিলকে বাঁকা করে দিলেন। (আস সফ : ৫)

মূসা (আ.)কে তারা উৎপীড়ন করতো কিভাবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন নির্দেশ ফাঁকি দেয়ার, পাশ কাটানোর উদ্দেশ্যে আবোল-তাবোল ও জটিল-কুটিল প্রশ্নের অবতারণা করতো। আল্লাহ তায়ালা এটাকেই বাঁকা পথে চলা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর এর পরিণামে সত্যি সত্যি আল্লাহ তাদের দিলকে বক্র করে দিয়েছেন– এভাবে নবীর প্রতি ঈমানের

ঘোষণা দেয়ার পরও ফাসেকদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে নিজেদের কর্মদোষে।

আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মুহাম্মাদীকে এই রোগ থেকে মুক্ত রাখার জন্যেই বনী ইসরাঈলের কীর্তিকলাপ ও তার পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করেছেন। সেই সাথে হেদায়াত লাভের পর হৃদয়ের বক্রতার শিকার হয়ে যাতে আবার গোমরাহীর শিকারে পরিণত না হয় এই জন্যে দোয়া শিখিয়েছেন :

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ج اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ-

হে আমাদের রব! একবার হেদায়াত দানের পর তুমি আমাদের হৃদয়কে বাঁকা করে দিও না। তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে খাস রহমত দান কর, তুমি তো অতিশয় দাতা ও দয়ালু। (আলে ইমরান : ৮)

তিন: এই পর্যায়ের তৃতীয় কারণটি হলো, অন্তরের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়-সন্দেহের প্রবণতা। সাধারণত এই মানসিকতা জন্মলাভ করে লাভ-ক্ষতির জাগতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও হিসাব-নিকাশের প্রবণতা থেকেই। আল কোরআনে সূরা হাদীদের মাধ্যমে আখেরাতের ঈমানদার ও মুনাফিকদের সংলাপের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এই সত্যটাই ধরা পড়ে। আল্লাহ বলেছেন :

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ج قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ط فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ط بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ - يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ط قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الاَمَانِىُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ.

সেই দিন মুনাফিক নারী পুরুষদের অবস্থা এমন হবে যে, তারা মুমিনদেরকে

ডেকে বলবে, একটু আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখ না। যাতে করে আমরা তোমাদের নূর থেকে একটু ফায়দা নিতে পারি। কিন্তু তাদের বলা হবে, পেছনে ভাগ। অন্য কোথাও নূর তালাশ করে দেখ। অতঃপর তাদের মাঝে একটা প্রাচীর দিয়ে আড়াল করে দেয়া হবে। যার একটা দরজা থাকবে। সেই দরজার ভেতরে থাকবে রহমত, আর বাইরে থাকবে আজাব, তারা (মুনাফিক) মুমিনদেরকে ডেকে ডেকে বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? মুমিনরা উত্তরে বলবে, হ্যাঁ, ছিলে তো বটেই, তবে তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ফেতনার শিকারে পরিণত করেছিলে। তোমরা ছিলে সুযোগ সন্ধানী, সুবিধাবাদী, তোমরা ছিলে সন্দেহ-সংশয়ের শিকার। মিথ্যা আশার ছলনায় তোমরা ধোঁকা খেয়েছ। অবশেষে আল্লাহর শেষ সিদ্ধান্ত এসেই গেছে। আর সেই ধোঁকাবাজ (শয়তান) শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারেও ধোঁকায় ফেলে রাখতে সক্ষম হয়েছে। (আল হাদীদ : ১৩, ১৪)

উক্ত আয়াতের শেষের দিকের কথাগুলো সুযোগ সন্ধানী ও সুবিধাবাদী মন-মানসিকতা, সন্দেহ-সংশয় এবং মিথ্যা আশার ছলনা এই তিনটি জিনিসই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় বস্তুবাদী চিন্তা থেকে, লাভ-ক্ষতির জাগতিক হিসাব-নিকাশ থেকে। যা পরিণামে আনুগত্যহীনতার জন্ম দিয়ে থাকে।

আনুগত্যের পরিবেশ সৃষ্টির রূহানী উপকরণ

এই বিষয়টা বিশেষ করে দায়িত্বশীলদের জন্যে। কিন্তু সর্বস্তরের দায়িত্বশীল তো কর্মীদের মধ্য থেকেই এসে থাকে। তা ছাড়া সংগঠনের বাইরে জনগোষ্ঠীর মাঝে আন্দোলনের প্রভাব বলয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাধারণ কর্মীরাও তো পরিচালনা বা নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে থাকে। কাজেই নেতা-কর্মী সবার জন্যেই এটা প্রযোজ্য।

আনুগত্যের পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমার জানা মতে তিনটি উপকরণকে রূহানী উপকরণ বলা যায়। অথবা এই তিনটিকে কেন্দ্র করে আনুগত্যের ক্ষেত্রে রূহানী পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এক : সর্ব পর্যায়ে দায়িত্বশীল ব্যক্তিগতভাবে এবং সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে। এই পথে উন্নতির জন্যে প্রতিনিয়ত আত্মসমালোচনার সাথে এই আনুগত্যের মান বাড়ানোর চেষ্টা করবে।

দুই : কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় বডির সিদ্ধান্তের প্রতি নিষ্ঠার সাথে শ্রদ্ধা পোষণ করবে। অত্যন্ত যত্ন সহকারে তা বাস্তবায়নের প্রয়াস চালাবে। আর অধস্তন সংগঠনের নেতৃত্বের দায়িত্বে যারা থাকবে তাদের উর্ধ্বতন সংগঠনের, উর্ধ্বতন নেতার আনুগত্যের ব্যাপারে আদর্শ স্থাপনের প্রয়াস পেতে হবে।

তিন : যাদের সাথে নিয়ে সংগঠন পরিচালনা করা হচ্ছে, যাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কামনা করা হয়, তাদের জন্যে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দোয়া করা অভ্যাসে পরিণত হতে হবে।

এছাড়া নেতৃত্ব যারা দেবে বা সংগঠন যারা পরিচালনা করবে, তাদেরকে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কয়েকটি ব্যাপারে অগ্রগামী হতে হবে। নিজস্ব সহকর্মী, সাথী-সঙ্গীর গণ্ডি পেরিয়ে সাধারণ মানুষও তাদের এই অগ্রগামী ভূমিকা বাস্তবে উপলব্ধি করবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা স্বীকারও করবে।

(এক) ঈমানী শক্তি ও ঈমানের দাবী পূরণের ক্ষেত্রে

(দুই) ঈমানী শক্তি অর্জন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে

(তিন) আমল, আখলাক ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে

(চার) সাংগঠনিক যোগ্যতা ও দক্ষতার ক্ষেত্রে

(পাঁচ) মাঠে ময়দানের কর্মতৎপরতা ও ত্যাগ, কোরবানী ও ঝুঁকি নেয়ার ক্ষেত্রে।

উল্লিখিত পাঁচটি ব্যাপারে কোন নেতা বা পরিচালক অগ্রগামী হলে তার প্রতি কর্মী তথা সাধারণ মানুষের মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ভক্তি শ্রদ্ধা সৃষ্টি হতে বাধ্য। এই ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে দ্বীনি আবেগ জড়িত হওয়াটাও একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। নেতা এই পর্যায়ে পৌছতে পারলেই কর্মীরা তাকে প্রাণঢালা ভালবাসা, তার জন্যে প্রাণ খুলে দোয়া করে। তার কথায় সাড়া দিতে গিয়ে যে কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হয় দ্বিধাহীন চিত্তে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
পরামর্শ

আমরা সংগঠন প্রসঙ্গে আলোচনা করে এসেছি যে, আন্দোলন ও সংগঠনের প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করে দুটো জিনিস তার একটা হলো– পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করা, অপরটি হলো– সংশোধনের উদ্দেশ্যে গঠনমূলক সমালোচনা। শূরায়ী নেজাম ইসলামী সংগঠনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পরামর্শ দেয়া নেয়া বা পরামর্শের ভিত্তিতে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা এতো জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ প্রথমতঃ এটা আল্লাহর নির্দেশ। নবী (সা.) ওহীর মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছেন, তবুও তাকে তাঁর সাথী-সহকর্মীদের পরামর্শে শরীক করার প্রত্যক্ষ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর নির্দেশ :

وَشَاوِرْهُمْ فِى الاَمْرِ.

বিভিন্ন কার্যক্রমে তাদের পরামর্শ নাও, তাদের সাথে মতামত বিনিময় কর। (আলে ইমরান : ১৫৯)

দ্বিতীয়তঃ মুহাম্মদ (সা.) নিজে আল্লাহর নির্দেশের আলোকে সাহাবায়ে কেরামের সাথে বিভিন্ন ব্যাপারে পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তৃতীয়তঃ গোটা সাহাবায়ে কেরামের (রা.) জামায়াত এর উপর আমল করেছেন। স্বয়ং আল্লাহ তার সাক্ষ্য পেশ করেছেন– আল কোরআন ঘোষণা করেছে:

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ.

নিজেদের যাবতীয় সামগ্রিক ব্যাপারে নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে। (আশ শূরা: ৩৮)

উক্ত কথায় এটা বলা হয়নি যে, তাদের কাজ পরামর্শের ভিত্তিতে চলতে হবে, বরং এটা এসেছে একটা বাস্তব সত্যের বিবৃতিস্বরূপ। সাহাবায়ে কেরামের জামায়াত তখন এই গুণের অধিকারী হয়েছিল। পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতেই তারা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন।

সাহাবায়ে কেরামের জামায়াতের মধ্য থেকে শীর্ষস্থানীয় হলেন খোলাফায়ে রাশেদীন। তারা ইসলামী খেলাফতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে গিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ করেছেন। তারা সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ করেছেন সব বিষয়ে। মুসলমানদের সাথে পরামর্শের ব্যাপারটিও তার অন্যতম প্রধান বিষয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে তাই যে কোন ঐতিহাসিককেই স্বীকার করতে হয় যে, শূরায়ী নেজাম ছিল এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পরামর্শের গুরুত্ব সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস

اِذَا كَانَتْ اُمَرَاؤُكُمْ خِيَارُكُمْ وَاَغْنِيَاؤُكُمْ سَمْحَاؤُكُمْ وَاَمْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُالاَرْضِ خَيْرٌ مِّنْ بَطْنِهَا وَاِذَا كَانَ اُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَاَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلاَؤُكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ اِلٰى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا.

রাসূল (সা.) বলেছেন, যখন তোমাদের নেতারা হবেন ভাল মানুষ, ধনীরা হবেন দানশীল এবং তোমাদের কার্যক্রম চলবে পরামর্শের ভিত্তিতে তখন মাটির উপরের ভাগ নীচের ভাগ থেকে উত্তম হবে। আর যখন তোমাদের নেতারা হবে খারাপ লোক, ধনীরা হবে কৃপণ এবং নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব যাবে নারীদের হাতে তখন পৃথিবীর উপরের অংশের চেয়ে নীচের অংশ হবে উত্তম। (তিরমিযী)

يَقُوْلُ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنْ بَايَعَ اَمِيْرًا عَنْ غَيْرِ مُشْوَرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلاَبَيْعَةَ لَهُ وَلاَ الَّذِىْ بَايَعَهُ ـ

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়াই আমীর হিসেবে বাইয়াত নেয়, তার বাইয়াত বৈধ হবে না। আর যারা তার ইমারতের বাইয়াত গ্রহণ করবে, তাদের বাইয়াতও বৈধ হবে না। (মুসনাদে আহমদ)

مَانَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ وَلاَ خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ-

যে ব্যক্তি পরামর্শ নিয়ে কাজ করে তাকে কখনও লজ্জিত হতে হয় না। আর যে বা যারা ভেবে চিন্তে ইস্তেখারা করে কাজ করে তাকে ঠকতে হয় না।

اَلْمُسْتَشَارُ الْمُؤْتَمَنُ.

যে পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করে সে নিরাপদ থাকে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে পরামর্শ ভিত্তিক কাজে দুটো বড় উপকারিতা আমরা দেখতে পাই :

এক : সাথী-সহকর্মী মূলত যারা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে মাঠে ময়দানে দায়িত্ব পালন করে থাকে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ দেয়ার সুযোগ দিলে বা তাদের সাথে পরামর্শ করলে আনুগত্যে স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সাথী-সহকর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব অনুভূতি বৃদ্ধি পায়। খোদা-না-খাস্তা কখনও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কোন প্রকারে অসুবিধা দেখা দিলে বিরূপ সমালোচনা ও অবাঞ্ছিত মন্তব্যের ক্ষতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার কোনই সুযোগ থাকে না।

দুই : পরামর্শে অংশগ্রহণের ফলে কাজের গুরুত্বের উপলব্ধি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। এই কারণে সাথী-সহকর্মীদের মধ্যে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়, ফলে কাজে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বরকত যোগ হয়।

বদরের যুদ্ধের ব্যাপারে রাসূল (সা.) আনসারদের সাথে যখন পরামর্শ করলেন তাদের উৎসাহের সীমা থকল না। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘোষণা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যদি বলেন সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে, আমরা বিনা দ্বিধায় তাতেও প্রস্তুত আছি। আমরা কওমে মূসার মত উক্তি করব না।

পরামর্শ কারা দেবে

পরামর্শের ক্ষেত্রকে আমরা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। ১. সর্ব সাধারণের পরামর্শ ২. দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের পরামর্শ ৩. আহলে রায় বা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ।

যে বিষয় যাদের সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা যেখানে যাদের স্বার্থ ও অধিকার জড়িত, সেখানে তাদের সাথে আলোচনা বা পরামর্শ করতে হবে। যেমন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এনে যদি আমরা এই ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করি তাহলে এভাবে বুঝা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপ্রধান এবং রাষ্ট্রের পার্লামেন্ট গঠন ইত্যাদির সাথে সর্বসাধারণের স্বার্থ জড়িত, সুতরাং এখানে সর্বসাধারণের মতামত নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মতামত নেয়াটাই এখানে বড় কথা; প্রক্রিয়া সময়-সুযোগ ও অবস্থা বুঝে নির্ধারণ করা হবে। বাকি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের আস্থাভাজন বিভিন্ন

পর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা পরামর্শ করলেই চলবে। কোন বিশেষ বিশেষ প্রকল্প ইত্যাদি প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে বিশেষ বিশেষ বিভাগের বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শই বাস্তবভিত্তিক।

অনুরূপভাবে সংগঠনের আওতায় আমরা ব্যাপারটা সহজেই বুঝে নিতে পারি। যেখানে ক্যাডারভুক্ত সব লোকেরা জড়িত সেখানে ক্যডারভুক্ত সব ব্যক্তির অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে। ক্যাডারের বাইরের লোকেরাও অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সে সব ব্যাপারে তাদের সাংগঠনিক অবস্থান সম্পর্কে কোন অস্পষ্টতা না রেখেও পরামর্শ দেয়া-নেয়ার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা যেতে পারে।

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল ইস্যুতে সংগঠনের বিশেষজ্ঞদের রায়ের প্রতি আস্থা রাখা যেতে পারে।

আন্দোলন এবং সংগঠনে পরামর্শের ব্যাপারটি বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের মধ্যেই বেশী জরুরী। দায়িত্বশীলদের মাঝে মন-খোলা পরামর্শের পরিবেশ না থাকলে একটা সংগঠনের আভ্যন্তরীণ সংহতিই থাকতে পারে না। কারণ মানুষ মাত্রই চিন্তাশীল। নিঃসন্দেহে দায়িত্বশীলগণ আরও বেশী চিন্তা করে থাকেন। চিন্তা তাদের মগজে এনে দেয় মাঠে ময়দানের অভিজ্ঞতা এবং চাহিদা। এভাবে দয়িত্বশীলগণের চিন্তার বিনিময় না হলে, ভাবের আদান-প্রদান না হলে চিন্তার ঐক্য গড়ে উঠতে পারে না। অথচ চিন্তার ঐক্য ছাড়া সংগঠনের কোন সার্থকতাই থাকতে পারে না। হাদিসে দায়িত্বশীলদের পরামর্শের গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ الاَمِيْرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ صِدْقٍ اِنْ نَسِى ذَكَّرَهُ وَاِنْ ذَكَّرَ اَعَانَهُ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهِ غَيْرِ ذٰلِكَ جعَلَ لَهُ وَزِيْرَ سُوْءٍ اِنْ نَسِى لَمْ يُذَكِّرْهُ وَاِنْ ذَكَّرَ لَمْ يُعِنْهُ-

আল্লাহ যখন কোন আমীরের ভাল চান তাহলে তাঁর সত্যবাদী উজির নির্বাচিত করেন, আমীর কিছু ভুলে গেলে তিনি তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেন, আমীর কোন কাজ করতে চাইলে সে কাজে তাকে সহযোগিতা করেন। আল্লাহ যদি আমীরের অমঙ্গল চান তাহলে তার জন্যে মিথ্যাবাদী উজির নিয়োগ করেন, তিনি কোন কাজ ভালভাবে তাকে স্মরণ করিয়ে দেন না, আমীর কোন কাজ

করতে ইচ্ছে করলে তিনি সে কাজে তার সহযোগী হন না। (আবু দাউদ)

পরামর্শ কিভাবে দেবে

পরামর্শ দেয়া অন্যান্য সংস্থা সংগঠনের একটা গঠনতান্ত্রিক অধিকার আছে। কিন্তু ইসলামী সমাজে ও সংগঠনে এটা নিছক অধিকার মাত্র নয়। এটা একটা পবিত্র আমানত। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্যে কোরআন সুন্নাহর আলোকে খোদার দেয়া বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে বাস্তব কর্মকৌশল উদ্ভাবন ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা দান করা প্রত্যেকের দ্বীনি দায়িত্ব। কোন সময়ে কোন দিক থেকে ক্ষতির আশঙ্কা মনে হলে, সেই ক্ষতি থেকে সংগঠনকে রক্ষা করার জন্যে এই সম্পর্কে দায়িত্বশীলদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা একটা পবিত্র আমানত। ক্ষতির আশঙ্কা মনে জাগল অথচ দায়িত্বশীলকে জানালাম না, কল্যাণ চিন্তা মগজে এলো কিন্তু দায়িত্বশীলকে জানানো হলো না তাহলে আল্লাহর দরবারে খেয়ানতকারী হিসেবে জবাবদিহি করতে হবে।

পরামর্শের এই দ্বীনি-ঈমানী মর্যাদাকে সামনে রেখে আমার দায়িত্ব শুধু স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন পরামর্শ মনে এলেই বলে দেয়া– তাই নয়। আন্দোলনে ও সংগঠনের উন্নতি অগ্রগতি সম্পর্কে সবাইকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। চিন্তাশক্তি ও বিবেক বুদ্ধির বিকাশ ঘটাবার চেষ্টাও করতে হবে যাতে করে সংগঠনকে ক্ষতিকর দিক থেকে হেফাজত করার ও কল্যাণ এবং অগ্রগতির দিকে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে বাস্তব সহযোগিতা দান করা সম্ভব হয়।

আন্দোলন ও সংগঠনের সার্বিক কল্যাণকে সামনে রেখে চিন্তা করতে হবে, পরামর্শ দিতে হবে ঠিকই কিন্তু ঐ ব্যাপারে সংগঠন নির্ধারিত নিয়ম পদ্ধতির বহির্ভূত কোন উপায় অবলম্বন করা যাবে না। নিজের মনের চিন্তা ও পরামর্শ প্রথমতঃ নিজের নিকটস্থ দায়িত্বশীলের কাছেই ব্যক্ত করতে হবে। এরপর সংগঠনের দায়িত্বশীলদের বডির কাছেও বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ লিখিতভাবে পেশ করা যেতে পারে, পরামর্শ যিনি বা যারা দেবেন, তারা তাদের দিক থেকে চিন্তা-ভাবনা করেই দেবেন। তাদের পরামর্শ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে করেই দেবেন। কিন্তু সেই সাথে তাদেরকে মনে রাখতে হবে, তার মত অন্যান্যদেরকে আল্লাহ তায়ালা চিন্তা করার মত বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। সুতরাং তারটাই গ্রহণ করতে হবে এই মন-মানসিকতা নিয়ে পরামর্শ দেয়া ঠিক হবে না। বরং পরামর্শদাতার মন এতটা উন্মুক্ত থাকতে হবে যে, তার পরামর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তও যদি

হয় তাহলে সে দ্বিধাহীনচিত্তে তা মেনে নেবে। তার মনের সপক্ষে এবং বিপক্ষে সে কোন মন্তব্যও করবে না।

মনে রাখতে হবে, মানুষের পক্ষে মতামত কোরবানী দেয়াটাই বড় কোরবানী। মানুষ অনেক ত্যাগ-কোরবানীর নজীর সৃষ্টি করার পরও মত কোরবানীর পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে যায়। অথচ জামায়াতী জিন্দেগীর জন্যে এই কোরবানীই সবচেয়ে জরুরী। জামায়াতী ফায়সালার কাছে যে ব্যক্তিগত রায় বা মত কোরবানী করতে ব্যর্থ হয় সে প্রকৃতপক্ষে জামায়াতী জীবনযাপনেই ব্যর্থ হয়। পরিণামে এক সময় ছিটকে পড়ার আশঙ্কা থাকে। আন্দোলন ও সংগঠনের অনেক দূর অগ্রসর হওয়ার পরও যারা ছিটকে পড়ে তারা মূলত এই ব্যর্থতার কারণেই ছিটকে পড়ে। তাই চিন্তা ভাবনা ও পরামর্শ উদ্ভাবনের মুহূর্তে সবাইকে জামায়াতী জিন্দেগীর এই চাহিদা এবং বাস্তবতাকে অবশ্যই সামনে রাখতে হবে। হাজার মতের, একশ' মতের ভিত্তিতে কোনদিন আন্দোলন সংগঠন চলতে পারে না, সংগঠনকে একটা মতের উপর এসেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কাজেই শত শত হাজার হাজার কর্মী যার যার মতের উপর জিদ করলে বাস্তবে কি দশাটা দাঁড়ায় তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না।

চিন্তার ঐক্যই আদর্শবাদী আন্দোলনের ভিত্তি এবং শক্তি। সুতরাং যথাযথ ফোরামের বাইরে সংগঠনের ব্যক্তি তার পরামর্শকে মূল্যবান এবং অপরিহার্য মনে করে যত্রতত্র প্রচার করতে পারে না। তার সপক্ষে জনমত সৃষ্টির কোন প্রয়াসও চালাতে পারে না। কোন সংগঠনে এমন অনুমতি থাকলে সে সংগঠন চিন্তার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির শিকার হতে বাধ্য। অহীর জ্ঞান ছাড়া আর কোন জ্ঞানকেই যেহেতু আমরা নির্ভুল মনে করি না, সেই হিসেবে যদিও এটা বলা মুশকিল যে, সামষ্টিক সিদ্ধান্ত কখনও ভুল হয় না, সব সময়ই নির্ভুল হতে বাধ্য। কিন্তু এতটুকু বলতে দ্বিধা নেই– এতেই ভুলের আশঙ্কা থাকে সবচেয়ে কম। কাজেই ব্যক্তির মতামত নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে সামষ্টিক রায়ের কাছে নিজের রায় প্রত্যাহার করে নেয়াতেই সর্বাধিক কল্যাণ রয়েছে– সংগঠনের জনশক্তির মধ্যে এই মর্মে Motivation থাকতে হবে।

সপ্তম অধ্যায়

সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনা

ব্যক্তি গঠনের জন্যে আত্ম-সমালোচনা এবং সাংগঠনিক সুস্থতা, সংশোধন ও গতিশীলতার জন্যে গঠনমূলক সমালোচনার সুযোগ থাকা অপরিহার্য। এই আত্ম-সমালোচনা ও সমালোচনা ইসলামের একটা পরিভাষা হিসেবে ইহতেসাব এবং মুহাসাবা নামেই পরিচিত। ইহতেসাব ও মুহাসাবা দুটোরই অর্থ হিসাব নেয়া। ইহতেসাব– হিসাব আদায় করা। মুহাসাবা– পরস্পরে একে অপরের হিসাব নেয়া। এই হিসাব নেয়া বা আদায়টা প্রকৃতপক্ষে আখেরাতে আল্লাহর কাছে যে হিসাব দিতে হবে, তার পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমাদের ব্যক্তিগতভাবে সবাইকে আল্লাহর কাছে এই দুনিয়ার যাবতীয় কার্যক্রম, যাবতীয় দায়দায়িত্ব সম্পর্কে হিসাব দিতে হবে। সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করতে গিয়ে আমাদের পরস্পরের প্রতিও দায়িত্ব রয়েছে। অপর ভাইকেও সেই হিসাবের ব্যাপারে এই দুনিয়ায় থাকতেই সাহায্য সহযোগিতা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সেই সাথে আমাদের সামষ্টিক কার্যক্রমের ভালমন্দের দায়-দায়িত্বও আমাদের বহন করতে হয়– সুতরাং ইহতেসাব ও মুহাসাবা আমাদের করতে হয় তিনটি পর্যায়ে :

১. ব্যক্তিগত ইহতেসাব বা আত্মসমালোচনা, ২. সাথী ও বন্ধুদের একে অপরের মুহাসাবা, ৩. সামষ্টিক কার্যক্রমের মুহাসাবা বা পর্যালোচনা।

আমাদের তিন পর্যায়ের মুহসাবাই আখেরাতের জবাবদিহি থেকে বাঁচবার লক্ষ্যে। সুতরাং তিন পর্যায়ের মুহাসাবা পদ্ধতি আলোচনার আগে আখেরাতের হিসাবের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের ঘোষণার সাথে একবার পরিচিত হওয়া যাক। কোরআন ঘোষণা করছে :

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ–

মানুষের হিসাব অতি নিকটে ঘনিয়ে আসছে অথচ তারা গাফলতির মধ্যে বিমুখ হয়ে পড়ে রয়েছে। (আল আম্বিয়া : ১)

إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ-

সন্দেহ নেই তাদেরকে আমাদের কাছেই ফিরে আসতে হবে। অতঃপর আমাকে তাদের হিসাব নিতে হবে। (আল গাশিয়াহ : ২৫)

إِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ-

নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (আলে ইমরান : ১৯৯)

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ-

যাদের প্রতি রাসূল পাঠানো হয়েছিল আমি তাদের অবশ্য অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করে ছাড়বো। আর ঐ সব নবী-রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসাবাদ করবো।

(আল আ'রাফ : ৬)

وَإِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ج وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ-

অবশ্যই এই কিতাব আপনার জন্যে এবং আপনার কওমের জন্যে একটি স্মারক, আর আপনারা সবাই অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবেন।

(আয যুখরুফ : ৪৪)

وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (আন নাহল : ৯৩)

হাদিসে রাসূলে বলা হয়েছে:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ، اَلاِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِىْ اَهْلِهٖ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ-

তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই যার যার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবে। দেশের শাসক একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাকে

তার দেশবাসীর প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। একজন পুরুষ তার সংসারের দায়িত্বশীল, এই দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। স্ত্রী স্বামীর সংসারে সন্তানাদি দেখাশুনার জন্যে দায়িত্বশীলা– তাকে তার ঐ দায়িত্বের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। জেনে রাখ, তোমরা সবাই যার যার জায়গায় দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই এইজন্যে জবাবদিহি করতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

এক : ব্যক্তিগত ইহতেসাব বা আত্মসমালোচনা

যে বা যারা ব্যক্তিগতভাবে ইহতেসাব বা আত্মসমালোচনা করে অভ্যস্ত নয় সে বা তারা অন্য ভাইয়ের ভুল সংশোধনের উদ্দেশ্যে বা সামষ্টিক কার্যক্রমের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ইনসাফপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে না। এই পর্যায়ের ইহতেসাবের ফলশ্রুতিতে ব্যক্তি নিজের ভুল ক্রটিকে বড় করে দেখতে অভ্যস্ত হয় এবং অপরের ভুল ক্রটিকে সে তুলনায় অনেক নগন্য মনে করে। পক্ষান্তরে নিজের ভাল কাজগুলোর পরিবর্তে অপরের ভাল কাজগুলোকে বড় করে দেখার মন-মানসিকতার অধিকারী হয়। এভাবে অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার বা ছোট করে দেখার মানসিক ব্যাধি থেকে সে বা তারা নিজেদেরকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়।

ব্যক্তিগত ইহতেসাবের পদ্ধতি

এই ব্যক্তিগত পর্যায়ের ইহতেসাবও আমরা তিন ভাবে করতে পারি (১) আনুষ্ঠানিকভাবে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণ ও পরিচালনার মুহূর্তটা সর্বোত্তম মুহূর্ত। দিনান্তরের এই মুহূর্তটিতেই আমাদের কার্যক্রমের চিত্রটি বলে দেয়– আমরা কি করেছি, আর কি করতে পারিনি। এর অনিবার্য দাবী হলো যা কিছু করতে পারিনি, করা সম্ভব হয়নি, সে জন্যে অনুতপ্ত হওয়া, অনুশোচনা করা এবং আল্লাহর কাছে খালেস দিলে তওবা করে ভবিষ্যতের জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। আর যা কিছু করতে পেরেছি তার জন্যেও আল্লাহ তায়ালার কাছে শুকরিয়া আদায় করে তার পছন্দনীয় কাজে আরও বেশী বেশী তৌফিক কামনা করা।

২. স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোরআন এবং হাদিস পড়ার মুহূর্তে, আত্মসমালোচনা বা আত্মজিজ্ঞাসার অভ্যাস গড়ে তোলা। সেই সাথে ই লামী সাহিত্য পাঠের মুহূর্তে দায়িত্বশীলদের হেদায়েতপূর্ণ ভাষণসমূহের মুহূর্তেও ঐভাবে আত্মসমালোচনার

মাধ্যমে ব্যক্তির কি আছে কি নেই এর যথার্থ মূল্যায়ন করে নিজের জন্যে একটা কঠোর সংকল্পজনিত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কোরআন হাদিস ও ইসলামী সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে আমাদের দায়িত্ব কর্তব্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আন্দোলন ও সংগঠনের আয়োজনে আমাদের যা কিছুই পড়াশুনা করতে হয় তাতে অবশ্য অবশ্যই কিছু বিষয় গ্রহণ করার এবং কিছু বিষয় বর্জন করার তাকিদ থাকে। যা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে, তার কতটা আমি গ্রহণ করতে পেরেছি আর যা বর্জন করতে বলা হয়েছে তার কতটা আমি বর্জন করতে পেরেছি, এই জিজ্ঞাসাই আত্ম-জিজ্ঞাসা, এবং আত্মশুদ্ধি ও আত্মগঠনের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। একজন আন্দোলনের কর্মী যখন পড়বে :

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلاَتِهِمْ خٰشِعُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ - اِلاَّ عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ. فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ لاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ-

নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করেছে ঈমানগ্রহণকারী লোকেরা যারা নিজেদের নামাজে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে, যারা বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকে, যারা জাকাতের পন্থায় কর্মতৎপর হয়, যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, নিজেদের স্ত্রীদের ছাড়া এবং সেই সকল মেয়েলোকদের ছাড়া যারা তাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীন আছে। এই ক্ষেত্রে (হেফাযত না করা হলে) তারা ভর্ৎসনাযোগ্য নয়। অবশ্য এদের ছাড়া অন্য কিছু চাইলে তারাই সীমালংঘনকারী হবে। যারা তাদের আমানত ও তাদের ওয়াদা-চুক্তি রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং নিজেদের নামাজসমূহের পূর্ণ হেফাযত করে। (আল মুমিনুন : ১–৯)

তখন তার মন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এই প্রশ্ন করতে থাকবে, আমি কি সেই সাফল্যমণ্ডিতদের অন্তর্ভুক্ত? আমি কি নামাজে এভাবে বিনয়ী হয়ে থাকি? বেহুদা কাজ কারবার থেকে আমি কি এভাবে নিজেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম? আমি কি আত্মশুদ্ধির কাজে এভাবে নিয়োজিত? আমি কি এভাবে নিজের লজ্জাস্থানের

হেফাযতে সক্ষম? আমি কি আমানত ও ওয়াদা রক্ষার ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত মানে আছি? নামাজ সমূহের দাবী সংরক্ষণে আমি কি যত্নবান? এমনিভাবে যখন পড়বে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَاتَجَسَّسُوْا وَلَايَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ-

হে ঈমানদার লোকেরা! খুব বেশী ধারণা পোষণ হতে বিরত থাক, কেননা কোন কোন ধারণা পাপ হয়ে থাকে। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি করো না। আর তোমাদের কেহ যেন কারও গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? তোমরা নিজেরাইতো এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাক। (আল হুজুরাত : ১২)

তখন পাঠকের মন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বলে উঠবে এই আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলা ও সিদ্ধান্ত নেয়ার রোগ ব্যাধি থেকে আমি কি মুক্ত? পরের ছিদ্রান্বেষণের প্রবণতা থেকে আমার মন-মগজ কি মুক্ত? অপরের নিন্দা চর্চার সর্বনাশা মানসিক ব্যধি থেকে আমি কি আমার মন-মগজকে সুস্থ রাখতে সক্ষম?

এভাবে হাদিসে রাসূল পড়াকালে যখন তার সামনে আসবে মুমিনের বিশেষ গুণাবলীর বর্ণনা। কবিরা গুণাহ সমূহের আলোচনা, মুনাফিকের আলামত প্রভৃতি– যখন তার মনকে সে জিজ্ঞাসা করবে, মুমিনের বাঞ্ছিত গুণাবলী থেকে তুমি কতটা দূরে অবস্থান করছ– কবিরা গুণাহের কোন কোনটা এখনও তোমার কাছ থেকে বিদায় নেয়নি, মুনাফিকের কোন কোন আলামত এখনও তোমার মাঝে বিদ্যমান? এইভাবে কোরআন ও হাদিস চর্চার মুহূর্তে নিজের খতিয়ান নেয়াকেই আমরা স্বতঃস্ফূর্ত ইহতেসাব বলতে পারি। এই ধরনের মনোভাব নফল নামাজ, বিশেষ করে তাহজ্জুদের নামাজের মুহূর্তেও সৃষ্টি হতে পারে। শেষ রাতের নীরব নিস্তব্ধ মুহূর্তে নিজের কানকে শুনাবার মত নিয়ন্ত্রিত আওয়াজ তারতিলের সাথে আখেরাতের আলোচনায় ভরপুর সূরা বা আয়াতসমূহের তেলাওয়াত– আল কোরআন এবং হাদিসে রাসূলে উল্লেখিত ভাষায় দোয়া ও মুনাজাত আল্লাহর বান্দাকে তার সান্নিধ্যে নিয়ে যায়, সত্যিকারের তওবা ও আত্মোপলব্ধির এটাই সর্বোত্তম মুহূর্ত যা কেবল হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা যেতে পারে– ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

৩. বাস্তব কর্মক্ষেত্রে কোথাও কোন ভুলত্রুটি হয়ে গেলে সাথে সাথে তা শুধরানোর উদ্যোগ নেয়া। যারা নিয়মিত আত্মসমালোচনা করে অভ্যস্ত তাদের কাজে কর্মে কোন ভুল ত্রুটি হলে তা সাথে সাথেই ধরা পড়বে। তখন এই ভুল চাপা না দিয়ে বা নির্ধারিত সময়ের আত্মসমালোচনার জন্যে রেখে না দিয়ে সাথে সাথে সংশোধনের প্রয়াস পাওয়া দরকার। এই ভুল কাজ-কর্মে হতে পারে, হতে পারে সহকর্মীদের সাথে কোন দুর্ব্যবহার হয়ে গেলে। এজন্যে অন্য কারো চাপে ত্রুটি স্বীকারের চেয়ে মনের তাকিদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেই নিজের ভুলের জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

দুই : পারস্পরিক মুহাসাবা

এক মুমিন আর এক মুমিনের ভাই, তারা পরস্পরে একে অপরের শক্তি যোগায়। দ্বীনের আসল দাবী শুভ কামনা– আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বতের দাবীকে সামনে রেখে মুসলমানদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এবং সর্বসাধারণের শুভকামনা করা। এই স্পিরিটকে সামনে রেখেই পরস্পরের ভুলত্রুটি শোধরানোর আন্তরিক প্রচেষ্টাই পারস্পরিক মুহাসাবা নামে অভিহিত। এখানে সংশোধন কামনা, নিজের ভাইকে দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা, উন্নতি ও কল্যাণের পথে চলতে সাহায্য করাই মুখ্য। যার অনিবার্য দাবী হল, নিজের মনকে সবার কল্যাণ কামনায় ভরপুর রাখতে হবে। মনে সবার জন্যে অকৃত্রিম দরদের অনুভূতি থাকতে হবে। সবার উন্নতি অগ্রগতির কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া ও মুনাজাতের অভ্যাস থাকতে হবে। ভাইদের সামগ্রিক তৎপরতা ও চরিত্রের ভাল ভাল দিকগুলোর যথার্থ স্বীকৃতি থাকতে হবে। এই কারণে তারা যতটা শ্রদ্ধাবোধের দাবী রাখে নিজের মনে ততটা শ্রদ্ধাবোধ অবশ্যই রাখতে হবে। তাহলেই মুহাসাবা করার মুহূর্তে ইনসাফ করা এবং সীমা লঙ্ঘনের মত দুর্বলতা থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। এই পারস্পরিক মুহাসাবাকেও আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি। (১) দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে কর্মীদের বা অধস্তন দায়িত্বশীলদের মুহাসাবা। (২) কর্মীদের বা অধস্তন দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে কর্মীদের বা অধস্তন দায়িত্বশীলদের মুহাসাবা। (৩) কর্মীদের বা অধস্তন দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলদের বা অধস্তন দায়িত্বশীলদের মুহাসাবা। (৪) কর্মীদের পরস্পরের একে অপরের মুহাসাবা।

যেহেতু স৲ ক্ষত্রে ব্যক্তিগত উ৲দ্যাগে ভাইয়ের সংশোধনই প্রকৃত লক্ষ্য, সুতরাং নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

১. এই ধরনের মুহাসাবার জন্যে একটা অন্তরঙ্গ পরিবেশ প্রয়োজন। সর্বাগ্রে সেই পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস পেতে হবে।

২. ভাইয়ের বা সাথী-সহকর্মীর যেসব ক্রটি বিচ্যুতির মুহাসাবা করতে চাই সেগুলো তার মধ্যে আছেই এমন ভাষায় ব্যক্ত করা ঠিক হবে না। বরং আমার কাছে এমন মনে হচ্ছে, হতে পারে আমি ভুল বুঝেছি, আসল ব্যাপারটা আপনার কাছ থেকে জেনে আমি আমার মনকে পরিষ্কার রাখতে চাই– এই ধরনের ভাষায়ই কথাগুলো উপস্থাপন করা উচিত। এটা নিছক একটা অভিনয় নয়। বাস্তবেও এমনি হতে পারে। কাজেই প্রথমে ব্যক্তির কাছ থেকে প্রকৃত অবস্থা জানাটাই অপরিহার্য। এভাবে ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে তার নিজস্ব বক্তব্য শুনার পর যদি সত্যি সত্যি মনে হয় যে, আমার ধারণা ঠিক ছিল না তাহলে আর অগ্রসর না হয়ে নিজের মনকে ভাই সম্পর্কে পরিষ্কার করে নেয়া দরকার।

আর যদি তার বক্তব্যের পরও এই ধারণা থেকেই যায় যে, তার মধ্যে ক্রটি-বিচ্যুতি বাস্তবেই বিরাজমান, তাহলে দরদপূর্ণ ভাষায় তাকে নছিহত করতে হবে। যদি এই নছিহত গ্রহণের জন্যে এই মুহূর্তে তাকে প্রস্তুত মনে না হয়, তাহলে উপযুক্ত কোন সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। ইতোমধ্যে তার জন্যে আল্লাহর কাছে বেশী বেশী দোয়া করতে হবে। অন্যদিকে উপযুক্ত সময় সৃষ্টি করে নেয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে।

অপরদিকে যার মুহাসাবা করা হয়, তাকে ভাইয়ের দরদপূর্ণ উদ্যোগকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রদ্ধা জানাতে হবে। নিজের দোষ-ক্রটি অনেক সময়ই নিজের চোখে ধরা পড়ে না। তাই ভাইয়ের এই পদক্ষেপকে নিজের জন্যে কল্যাণকর মনে করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে এবং ভাষার জোরে, যুক্তির জোরে নিজেকে দোষমুক্ত প্রমাণ করার কোন কৃত্রিম উপায়ের আশ্রয় না নিয়ে বরং ভুলক্রটি স্বীকৃতি দিয়ে সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেবে এবং এই ব্যাপারে ভাইয়ের আন্তরিক সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করবে। এই ব্যাপারে মুহাসাবাকারী ও মুহাসাবাকৃত ব্যক্তি যার যার জায়গায় বাঞ্ছিত ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হলে সত্যি এক জান্নাতী পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে মানুষের সংগঠনের অভ্যন্তরে।

মুহাসাবা বা সমালোচনা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে সাধারণ কর্মীদের জন্যে শিক্ষণীয় ও অনুসরণীয় উদাহরণ সৃষ্টি হওয়ার প্রয়োজন আছে। কারণ তাত্ত্বিক আলোচনায় এটাকে আমরা যত সহজভাবে পেশ করতে পারি, বাস্তবে কিন্তু এটা তত সহজ ব্যাপার নয়। সমালোচনা সহ্য করার মত,

নিজের ভুল ত্রুটি স্বীকার করার মত সৎ সাহসী লোকের আসলেই অভাব আছে। এই অভাব দূর করতে হলে কিছু ব্যক্তিকে নমুনা হিসেবে সামনে আসার প্রয়োজন আছে। আর এই নমুনা পেশ করতে হবে বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরকেই। ঐসব দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা খুবই ভাগ্যবান, যাদের সাথী-বন্ধুরা নিঃসংকোচে নির্দ্বিধায় তাদের দায়িত্বশীলদের ভুলত্রুটি শোধরানোর প্রয়াস পায়। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সংশোধন ও উন্নতি কামনা করে এবং বাস্তবে তা কার্যকর করার সুযোগ পায়। পক্ষান্তরে চরম দুর্ভাগ্য ঐসব নেতা ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণের, যাদের সাথী ও সহকর্মীগণ তাদের মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করে, মনে মনে বিক্ষুব্ধ হয়ে থাকে, তাদের মনের ক্ষোভ ভেতরে ভেতরে গুমরে মরে, অথচ নেতা বা দায়িত্বশীলদের আচরণের কারণে তারা তা প্রকাশ করতে সাহস পায় না বা প্রকাশ করতে চায় না। এমন পরিবেশ ইসলামী আন্দোলনের জন্যে একান্তই অবাঞ্ছিত।

এভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে, অন্তরঙ্গ পরিবেশে আলাপ আলোচনা চালালে শতকরা ৯৫% ভাগ ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া যাবে। সুতরাং ব্যাপারটা অনত্র নেয়ার কোন প্রয়োজনই দেখা দেয় না। কিন্তু যদি এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয় তাহলে পর্যায়ক্রমে যথাযথভাবে দায়িত্বশীল ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তির অনুমতিক্রমে কোন সামষ্টিক পরিবেশেও এটা উপস্থাপন করা যেতে পারে যাতে করে অন্যান্য ভাইদের নছিহতপূর্ণ সামষ্টিক বক্তব্যে তার মনে কোন পরিবর্তন এসে যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, এর বাইরে কোন ভাইদের বাস্তব দোষত্রুটির আলোচনাও শরীয়তের দৃষ্টিতে গীবত। যা থেকে বাঁচার চেষ্টা করা ব্যক্তির আখেরাতের স্বার্থে, আন্দোলন ও সংগঠনের স্বার্থে একান্তই অপরিহার্য। পারস্পরিক মুহাসাবার ক্ষেত্রে হাদিসে রাসূলের উপমাটি প্রণিধানযোগ্য। হাদিসে এক মুমিনকে অপর মুমিনের জন্যে আয়নাস্বরূপ বলা হয়েছে। আয়নার ভূমিকা কি? (১) আমার চেহারায় কোথায় কি আছে আমি দেখতে পাই না, আয়না আমাকে দেখিয়ে দেয়। (২) এই দেখবার ক্ষেত্রে আয়না তার নিজের দিক থেকে কিছুই বাড়িয়ে বা অতিরঞ্জিত করে দেখায় না। আবার কমও দেখায় না। (৩) আমি যতক্ষণ আয়নার সামনে থাকি ততক্ষণই সে আমার দোষত্রুটি আমাকে দেখায়। আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে সে এটা দেখায় না বা বলাবলি করে না। অনুরূপভাবে আমার নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি জানবার জন্যে অন্য ভাইকে একটা উত্তম অবলম্বন মনে করব। এই ত্রুটি দেখাতে গিয়ে আমরা বাড়াবাড়ি করব না। সর্বত্র এই নিয়ম-নীতির অনুসরণের মাধ্যমেই আমরা

সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধন গড়ে তুলে আল্লাহর ভালবাসার পাত্র হতে পারি।

তিন : সাংগঠনিক কাজের মুহাসাবা

সাংগঠনিক কাজে গতিশীলতা আনার জন্যে, সুস্থতার সাথে সংগঠন পরিচালনার জন্যে যেমন সর্বস্তরের জনশক্তির পরামর্শের প্রয়োজন আছে, তেমনি সবার মুহাসাবার সুযোগও বাঞ্ছনীয়। পরামর্শ যেমন যত্রতত্র, যেনতেন প্রকারের দেয়া ঠিক নয়। মুহাসাবাও তেমনি যত্রতত্র যেভাবে সেভাবে হতে পারে না। গঠনমূলক সমালোচনা যেমন আন্দোলনকে জীবনীশক্তি দান করে থাকে– লাগামছাড়া সমালোচনা আবার তেমনই একটা সংগঠনের জন্যে আত্মঘাতী প্রমাণিত হয়ে থাকে।

সাংগঠনিক মুহাসাবার উপায়

স্থানীয় সংগঠনের মুহাসাবা একদিকে উর্ধ্বতন সংগঠনের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। অপরদিকে এর সাথে সংশ্লিষ্ট জনশক্তির পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট জনশক্তির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ হয় ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে অথবা লিখিতভাবে দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে সাংগঠনিক কার্যক্রমের ব্যাপারে তার পর্যালোচনা পৌছাবে অথবা পর্যালোচনা বা মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে আয়োজিত কোন অনুষ্ঠানে তার বক্তব্য পেশ করবে। কিন্তু নিজের মূল্যায়ন বা পর্যালোচনাকেই সে একমাত্র নির্ভুল বা সঠিক পর্যালোচনা বা মূল্যায়ন মনে করবে না। সামষ্টিক পর্যালোচনা ও মূল্যায়নকে দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করার জন্যে তাকে সর্বাবস্থায় প্রস্তুত থাকতে হবে।

উর্ধ্বতন সংগঠনের কার্যক্রম প্রসঙ্গে নিজের মনোভাব বা মূল্যায়ন সম্পর্কে উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দকে নিজ নিজ এলাকার প্রতিনিধির মাধ্যমে ওয়াকেফহাল করার চেষ্টাই সর্বোত্তম পন্থা। কেউ চাইলে সরাসরি ওয়াকেফহাল করতে পারে। উর্ধ্বতন সংগঠনের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের যথার্থ ফোরাম কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা এবং সদস্য সম্মেলন জনশক্তির বাকী অংশের মতামত এদের মাধ্যমে জানতে হবে এবং এদের ফোরামে গৃহীত পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও মতামতকেই দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করার জন্যে মন-মেজাজকে সদা উন্মুক্ত রাখতে হবে। এর ব্যতিক্রম আচরণ পরিবেশকে দূষিত করে। আন্দোলন ও সংগঠনের সর্বস্তরের জনশক্তিকে এই ব্যাপারে সজাগ-সচেতন অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে হবে।

মতিউর রহমান নিজামীর অন্যান্য বই

- গণতন্ত্র গণবিপ্লব ও ইসলামী আন্দোলন
- পঞ্চম জাতীয় সংসদে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর আটটি ভাষণ
- জাতীয় সংসদে বক্তৃতামালা
- রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে
- কুরআন রমযান তাকওয়া
- ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ
- ইসলামী আন্দোলন চ্যালেঞ্জ ও মোকাবেলা
- ইসলামী আন্দোলনের পথ ও পাথেয়
- আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়
- কুরআনের আলোকে মু'মিনের জীবন
- আল কুরআনের পরিচয়
- দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব
- ইসলামী আন্দোলন: সমস্যা ও সম্ভাবনা
- ইসলামী সমাজ বিপ্লব
- এক পরাশক্তির অন্যায় যুদ্ধ আতঙ্কিত করেছে বিশ্বের মানুষকে
- ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের উপর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ভাষণ
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামকে সচেতন থাকতে হবে
- ৮ম জাতীয় সংসদের ৪টি ভাষণ